ম্যানগ্রোভ

২০২৫

২য় সংখ্যা

মোংলা সরকারি কলেজ

স্থাপিত : ১৯৮১

মোংলা সরকারি কলেজ

মোংলা, বাগেরহাট

কলেজবার্ষিকী

ম্যানগ্রোভ ২০২৫

দ্বিতীয় সংখ্যা

মোংলা সরকারি কলেজ
স্থাপিত : ১৯৮১

মোংলা সরকারি কলেজ
মোংলা, বাগেরহাট

কলেজবার্ষিকী

ম্যানগ্রোভ ২০২৫

দ্বিতীয় সংখ্যা

১৮ই মে, ২০২৫ খ্রি.

সম্পাদনা পরিষদ

শ্যামা প্রসাদ সেন, প্রভাষক, সমাজকর্ম
প্রদীপ অধিকারী, প্রভাষক, দর্শন বিভাগ
মনোজকান্তি বিশ্বাস, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
এস এম মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
মোঃ ইব্রাহীম খলিল, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

প্রকাশনা

মোংলা সরকারি কলেজ
মোংলা, বাগেরহাট

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

প্রফেসর কে. এম. রব্বানী

আলোকচিত্র গ্রহণে

এস এম মাহবুবুর রহমান

অক্ষরবিন্যাস ও অলংকরণ

মোঃ হাফিজুর রহমান

মুদ্রণ

রবি প্রিন্টিং প্রেস

শান্তিধাম মোড়, খুলনা। ফোন : ০১৭১১-২৯৫০৮৭

e-mail : rabipressbd@gmail.com

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

শুভেচ্ছাবাণী

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ঘেরা মোংলা– একদিকে পশুর নদী, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের কলতান আর শ্যামল সুন্দরবন। এমন অনন্য পরিবেশে গড়ে ওঠা মোংলা সরকারি কলেজ শুধুই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়; এটি শিক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ-সচেতনতা, সংস্কৃতি ও মানবিকতার এক স্পন্দিত ক্ষেত্র।

মোংলা সরকারি কলেজের বার্ষিকী 'ম্যানগ্রোভ'-এর ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আমি আনন্দিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো এমন একটি সংগঠন যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানে-গুণে-বিদ্যায় এক-এক জন আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। শিক্ষাজীবনে তারা অংশ নেবে সৃজনশীল কর্মে। একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারে সেজন্য লেখালেখি তথা সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশ, কাল, সমাজ ও জাতি সম্পর্কে তাদের ভাবনাগুলো লেখার মাধ্যমে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করবে যা আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তাদের এই সুলিখিত ভাবনাগুলো প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী প্রকাশনা। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের লেখার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে যে কলেজবার্ষিকী প্রকাশিত হচ্ছে তা মোংলা সরকারি কলেজের মানসদর্পণ হিসেবে প্রতিভাত হবে বলে আশাকরি।

কলেজ ম্যাগাজিন 'ম্যানগ্রোভ' নাম যেমন পরিবেশ পরিমণ্ডলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তেমনি এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও গভীর। ম্যানগ্রোভ গাছের মতোই শিক্ষার্থীরা প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের চিন্তা ও সৃজনশীলতা দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াক– এটাই এই ম্যাগাজিনের মূল প্রেরণা। প্রতিটি কবিতা, গল্প কিংবা প্রবন্ধ– যেন এক একটি ছোট ছোট জানালা, যেখান থেকে শিক্ষার্থীদের মনন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে। এই প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস জোগাবে, ভাবনার স্বাধীনতা দেবে এবং ভবিষ্যতের পথে তাদের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত করবে।

আমি 'ম্যানগ্রোভ'-এর প্রকাশনার সাথে যুক্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সম্পাদনা পরিষদ ও অধ্যক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাদের এই প্রয়াস আগামী প্রজন্মের মধ্যে পাঠ, চিন্তা ও সংস্কৃতির বীজবপনে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। একইসাথে 'ম্যানগ্রোভ' নিয়মিত প্রকাশিত হবে বলে আশা করছি।

(প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদ খান)

মোংলা সরকারি কলেজ
স্থাপিত : ১৯৮১

অধ্যক্ষ
মোংলা সরকারি কলেজ
মোংলা, বাগেরহাট

শুভেচ্ছাবাণী

সুন্দরবনের সবুজ ছায়া, বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি আর পশুর নদীর স্নিগ্ধ ধারা– এই অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত মোংলা সরকারি কলেজ শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির মেলবন্ধনের এক চমৎকার উদাহরণ। এখানে শিক্ষার্থীরা যেমন পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান লাভ করে, তেমনি প্রকৃতি থেকে শেখে ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের শিক্ষা। এই অনন্য প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক আবহে শিক্ষার আলো হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত, আরও অনুপ্রেরণাদায়ী।

এ জনপদের বিশেষ ভৌগোলিক বাস্তবতা আমাদের চিন্তাধারায় সৃষ্টি করেছে ভিন্নতা, প্রেরণা জুগিয়েছে সাহিত্যে, সৃজনশীলতায় ও বাস্তবজ্ঞান অর্জনে। নদীর জোয়ার-ভাটার মতো আমাদের জীবনেও আছে ওঠানামা, আছে নতুন সম্ভাবনার জোয়ার, আবার আছে প্রতিকূলতার ভাটা। আমরা শিখেছি কীভাবে প্রকৃতির ছন্দে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হয়– এটাই আমাদের শিক্ষার ভিত।

এই প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত হচ্ছে কলেজবার্ষিকী 'ম্যানগ্রোভ'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা, যা শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, কল্পনা ও সৃজনশীল প্রতিভাকে তুলে ধরার একটি চমৎকার মাধ্যম। একটি কলেজ ম্যাগাজিন শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে, লেখালেখির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং তাদের মননশীলতাকে আরও বিকশিত করে তোলে। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন নিজেদের ভাবনার কথা প্রকাশ করতে পারে, তেমনি শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজ ও শিক্ষার্থীদের অন্তর্দৃষ্টি উপলব্ধি করতে পারেন। তৈরি হয় নতুন-পুরাতনের মেলবন্ধন।

'ম্যানগ্রোভ' নামটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে টিকে থাকার প্রত্যয়, পরিবেশ ও জীবনের গভীর সম্পর্ক, আর প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার শিক্ষা। আমি আশা করি, এই ম্যাগাজিন আমাদের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল অভিযাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে থাকবে।

১৮ই মে, ১৯৮১ সালে মোংলা কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক পরে হলেও ২০২৪ সালে কলেজবার্ষিকী 'ম্যানগ্রোভ'-এর ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল এবং পাঠকসমাদৃত হয়েছিল। ২০২৫ সালে প্রকাশিত কলেজবার্ষিকী 'ম্যানগ্রোভ'-এর ২য় সংখ্যাও পাঠকসমাদৃত হবে এই কামনা করছি। আশাকরি, পাঠক এই সংখ্যার প্রতিটি পাতায় খুঁজে পাবেন মোংলার গন্ধ, পশুর নদীর জলের ঢেউ, পরিবেশ সচতেনতা আর সুন্দরবনের ছায়া। ১৮ই মে কলেজের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে এবারের 'ম্যানগ্রোভ'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা। আমরা প্রতিবছর কলেজের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে 'ম্যানগ্রোভ' প্রকাশ করতে চেষ্টা করবো।

একটি কলেজ ম্যাগাজিনের মান নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের লেখার সংখ্যা এবং মানের উপর। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের মনের ভাবনাগুলো লিখে থাকে। তবুও অনেক চেষ্টা করেও তাদের ম্যাগাজিনে লেখার জন্য তেমন সচেষ্ট করতে পারিনি। অল্পকিছু লেখা নেয়া সম্ভব হয়েছে। আগামীতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আরও বেশি করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

কলেজ বার্ষিকীর সঙ্গে যুক্ত সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সম্পাদনা পরিষদকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। আমরা বিশ্বাস করি, এই সংখ্যা পাঠকের মনে জাগাবে গর্ব, উষ্ণতা এবং ভাবনার বিস্তার। 'ম্যানগ্রোভ' কেবল একটি ম্যাগাজিন নয়– এটি আমাদের শিকড়, আমাদের স্বপ্ন, এবং প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বন্ধনের একটি শিল্পিত দলিল। আগামী দিনে 'ম্যানগ্রোভ' হয়ে উঠুক আমাদের জ্ঞান, চিন্তা, চেতনা, মনন ও সংস্কৃতির এক শক্তিশালী বাহক।

প্রফেসর কে এম রব্বানী)

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন আর বিশাল বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে, পশুর নদীর পূর্বকোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের "মোংলা সরকারি কলেজ" যা প্রকৃতি ও প্রগতির এক দুর্লভ সমন্বয়। এই পরিবেশে "মোংলা সরকারি কলেজ" শুধু জ্ঞানচর্চার নয়, বরং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানেরও এক অনন্য উদাহরণ।

মোংলা বন্দরে প্রতিদিন পণ্যবাহী জাহাজ আসে, আবার পাড়ি জমায়। পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় সুন্দরবন– এক অকৃত্রিম সবুজ প্রাচীর, যা শুধুই বন নয়, এ জনপদের সংস্কৃতি, জীবনধারা ও অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে নদীর জোয়ার-ভাটা শুধু ভূগোলের বিষয় নয়, আমাদের জীবনের ছন্দ, আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। বন্দরের কর্মচঞ্চলতা আর বনের নিস্তব্ধতা– এই বিপরীত দুই সুর এখানে যুগপৎ বাজে এক অপূর্ব সংগীতের মতো।

এই অনন্য প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কলেজবার্ষিকীর নাম "ম্যানগ্রোভ" রাখা কেবল একটি নামকরণ নয়– এ এক গভীর প্রতীক। ম্যানগ্রোভ গাছ যেমন লবণাক্ত জলেও শিকড় গেঁথে টিকে থাকে, তেমনি আমাদের শিক্ষার্থীরাও নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে গড়ে তোলে নিজেদের ভবিষ্যৎ। ম্যানগ্রোভ বন যেমন ভূমি রক্ষা করে, জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখে, তেমনি জ্ঞানচর্চা ও মানবিক মূল্যবোধের ছায়া দিয়ে কলেজও রক্ষা করে আমাদের ভবিষ্যতের পথ।

১৮ই মে কলেজের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 'ম্যানগ্রোভ'-এর ২য় সংখ্যা।

'ম্যানগ্রোভ'-এর এই দ্বিতীয় সংখ্যা সেই জীবনঘনিষ্ঠ প্রতিরোধশক্তি ও সৃষ্টিশীলতার প্রতিফলন। এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে শিক্ষার্থীদের কল্পনা, ভাবনা, অনুভব, গবেষণা আর স্মৃতির অভিজ্ঞান। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ইতিহাস, রম্য-রচনা, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা– সবকিছু মিলিয়ে এটি হয়ে উঠেছে মোংলার জলবায়ু, বনভূমি আর মানুষের মনোভূমির এক সাহিত্যিক প্রতিবিম্ব।

একটি কলেজ ম্যাগাজিন কেবল সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র নয়, বরং শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের এক উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম। লেখালেখি, চিন্তাভাবনা, গবেষণা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীরা খুঁজে পায় আত্মবিশ্বাস ও প্রকাশভঙ্গির স্বাধীনতা। 'ম্যানগ্রোভ' ম্যাগাজিন আমাদের শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার একটি সাহসী প্রয়াস, যা তাদের সৃজনশীল পথচলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

'ম্যানগ্রোভ'-এর এই দ্বিতীয় সংখ্যায় আমরা সেই প্রাকৃতিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের ভাবনা, সৃষ্টিশীলতা, অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা– সবখানেই আছে আমাদের সময়ের কথা, পরিবেশের প্রতিচ্ছবি, আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

আমরা বিশ্বাস করি, এই সংখ্যা পাঠকের মনে জাগাবে চিন্তার অনুরণন, আশার আলো ও গর্বের অনুভব– কারণ এটি শুধু একটি ম্যাগাজিন নয়, বরং মোংলা ও সুন্দরবনের প্রাণস্পন্দনের প্রতিধ্বনি।

সম্পাদনা পরিষদ
"ম্যানগ্রোভ"

সূচিপত্র

- সংক্ষিপ্ত কলেজ পরিচিতি ৭
- পাঠ অনুশীলন পদ্ধতি | শ্যামা প্রসাদ সেন ৯
- চিন্তার টপোলজি | অধ্যাপক কে এম রব্বানী ১৩
- মানুষ কিভাবে শেখে? | আরিফুজ্জামান ১৯
- ডিসক্যালকুলিয়া : গণিতের ভয় নাকি রোগ? | বিশ্বজিৎ মন্ডল ২৬
- সমাজকর্ম শিক্ষা | রঞ্জিতা মন্ডল ২৯
- সমাজ বিকাশের ধারা : প্রেক্ষিত কার্ল মার্ক্সের ধারণা | প্রদীপ অধিকারী ৩৩
- স্মৃতিতে অম্লান, মোংলা সরকারি কলেজ | প্রফেসর রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ৩৬
- আমাদের অদম্য মেধাবীরা | এস. এম. মাহবুবুর রহমান ৩৮
- মায়া | মোসাঃ খাদিজা খাতুন ৪৬
- মোবাইলে প্রবল আসক্তি শিক্ষার্থীদের জন্য মারাত্মক হুমকি | শেখ আনোয়ার হোসেন (পি আর এল) ৪৮
- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা | আ ই শ ম বাকী বিল্লাহ ৫১
- প্রকৃতিকবি ও মানবকবি কালিদাসের ঋতুসংহার | ড. অপর্ণা অধিকারী ৫৬
- রুদ্র-সাহিত্যে আঞ্চলিকতা ও স্বকীয় বানান রীতি | মনোজকান্তি বিশ্বাস ৬২
- আজও প্রাসঙ্গিক আজও আধুনিক অসাম্প্রদায়িক নজরুল | রূপাদাস ৭১
- দৃষ্টিভঙ্গি | প্রমীলা রায় ৭৩
- সুন্দরবনের পেশাজীবী সমম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা | ড. অসিত কুমার বসু ৭৪
- নবায়নযোগ্য জ্বালানিতেই আস্থা | সাহারা বেগম ৮১
- নাহ্‌ল | মমতাজ খানম ৮৭
- হরিণ | মোঃ ইব্রাহিম খলিল ৮৯
- সুন্দরবনের মধু | মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন ৯১
- দুবলার চরের রাস উদ্‌যাপন | দেবদাস বাড়ই ৯৩
- সুন্দরবনের মাছ | নন্দ কিশোর পাল ৯৭
- পরিবেশ দূষণ ও প্লাস্টিক বর্জন | বীনা বিশ্বাস ১০১
- ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য | শেফালী মন্ডল ১০৪
- চালনা বন্দর | নাসির উদ্দিন ১০৭
- বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন | মো: কামাল উদ্দিন ১০৯
- কোটা সংস্কার আন্দোলন | ইসরাত জাহান সূচি ১১২
- পহেলা বৈশাখ, ১৪৩২ | মনি আক্তার ১১৪
- অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ | মাহিয়া আফরোজ সাবা ১১৬
- বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর | দীক্ষা ঘরামী ১১৮
- রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ | নাঈমা ১২০

কবিতা :

- ইচ্ছেমতি | মনোজকান্তি বিশ্বাস ১২৩
- অপেক্ষা | মমতাজ খানম ১২৩
- নববর্ষের কবিতা | মোসাঃ নিলুফা খাতুন ১২৪
- শিক্ষকই শ্রেষ্ঠ | আইশম বাকী বিল্লাহ ১২৫
- মোংলা নদীর তীরে | সুদেব মুখার্জী ১২৫
- আমরা সেই যাত্রী | মারজানা আক্তার শিমলা ১২৬
- একুশে ফেব্রুয়ারি | স্বর্ণা ১২৬
- বন্ধু | আফসানা মিম ১২৭
- বাবা | শাওন ঢালী ১২৭
- আবু সাঈদ | সাথী আক্তার ১২৮
- আমার সোনার দেশ | আমিনা আক্তার মুন্নি ১২৯
- ধ্বংস | সৌরভ তামিম ১২৯
- তুমিহীনা থাকে না কোনো মানবিক মহিমা | মেহেদী হাসান ১৩০
- কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক-কর্মচারীদের তালিকা ১৩১
- কলেজের শিক্ষক কর্মকর্তাবৃন্দ ১৩৩
- কলেজের কর্মচারীবৃন্দ ১৩৬
- কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আলোকচিত্র ১৩৭

সংক্ষিপ্ত কলেজ পরিচিতি

কলেজের নাম	:	মোংলা সরকারি কলেজ
প্রতিষ্ঠাকালীন নাম	:	মোংলা কলেজ
প্রতিষ্ঠা	:	১৮/০৫/১৯৮১খ্রি.
জাতীয়করণ	:	৩০/০৩/২০১৬ খ্রি.
কলেজের EIIN	:	১১৫০২১
ডিগ্রি কোড	:	০১১০
এইচ এস সি কেন্দ্র কোড-মোংলা	:	২৩৯
কলেজ ই-মেইল	:	collegemongla@yahoo.com
কলেজ ওয়েবসাইট	:	www.Monglagovtcollege.edu.bd
বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা	:	২২০০ এর কাছাকাছি
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম অনুমোদন	:	০১/০৭/১৯৮২ খ্রি.
স্নাতক (পাস) শ্রেণির প্রথম অনুমোদন	:	০১/০৭/১৯৯২খ্রি.
স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির প্রথম অনুমোদন	:	০১/০৭/২০১১খ্রি.
বাগেরহাট জেলায় শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি	:	২০০৪ খ্রি.
প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ	:	জনাব সুনীল কুমার বিশ্বাস

❖ অধ্যক্ষবৃন্দের কর্মকাল

১। জনাব সুনীল কুমার বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ ১৮/০৫/১৯৮১ খ্রি. থেকে ২৬/১১/২০০৪ খ্রি.

২। জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার ০১/০৭/২০১০ খ্রি. থেকে ২৯/০৩/২০১৬ খ্রি.

৩। অধ্যাপক রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ২৩/০২/২০২৩ খ্রি. থেকে ৩০/০৫/২০২৩ খ্রি.

৪। অধ্যাপক কে এম রব্বানী ২৯ /১০/২০২৩ খ্রি. থেকে বর্তমান

❖ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষবৃন্দের কর্মকাল

১। জনাব তৈয়াবুর রহমান গাজী ২৭/১১/২০০৪ থেকে ০৯/০৫/২০০৮ খ্রি.

২। জনাব সুশীল কুমার সরকার ১০/০৫/২০০৮ থেকে ৩০/০৬/২০১০ খ্রি.

৩। জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার অফিসার ইন চার্জ ৩০/০৩/২০১৬ খ্রি. থেকে ০৪/০৩/২০২২ খ্রি.

৪। জনাব কুবের চন্দ্র মন্ডল ০৫/০৩/২০২২ খ্রি. থেকে ২২/০২/২০২৩ খ্রি.

৫। জনাব মল্লিক অহিদুজ্জামান ৩০/০৫/২০২৩ খ্রি. থেকে ৩১/০৮/২০২৩ খ্রি.

৬। জনাব শেখ আনোয়ার হোসেন ৩১/০৮/২০২৩ খ্রি. থেকে ২৮/১০/ ২০২৩ খ্রি.

❖ উপাধ্যক্ষের কর্মকাল

১। জনাব বিভাষ চন্দ্র বিশ্বাস ০১/০৭/২০১০ থেকে ০৭/০৩/২০১৬ খ্রি.

পাঠ অনুশীলন পদ্ধতি

শ্যামা প্রসাদ সেন
প্রভাষক, সমাজকর্ম বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

পড়াশোনা করার পর পাঠ্যবিষয় সহজে আত্মস্থ না হওয়া এবং খুব চেষ্টায় আত্মস্থ যদিওবা হয় তা আবার পরক্ষণেই ভুলে যাওয়া আমাদের স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের একটা বড় সমস্যা। কিভাবে পড়াশোনা করলে মনে থাকবে এবং কিভাবে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করা যাবে অনেক শিক্ষার্থীই তা জানতে চায়।

আমরা যা কিছু প্রতিদিন পড়াশোনা করি তার সবটুকুই মনে রাখতে পারি না। কিছু বিষয় দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের মনে থাকে। আবার কিছু বিষয় আছে যা শেখার পর অল্প সময়ের ব্যবধানেই ভুলে যাই। এর কারণ পাঠ্যবিষয় অনুশীলনের সাথে সাথে শিক্ষণ কি হারে কতটুকু হচ্ছে তা নির্ভর করে শিক্ষণের বিষয়বস্তু ও শিক্ষণপদ্ধতির উপর। তাছাড়াও অবশ্য শিক্ষার্থীর শিক্ষণে মনোযোগ ও মেধার উপরেও শিক্ষণের অগ্রগতি নির্ভর করে।

ত্রিশ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় আমার ধারণা, আমাদের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই জানে না কিভাবে অর্থাৎ কোন পদ্ধতিতে পাঠ্যবিষয় অনুশীলন করতে হয়। তাই শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের পাঠ অনুশীলনে তদুপরি পরীক্ষায় ভাল ফল অর্জনে কাজে আসবে এ প্রত্যাশা নিয়ে আমার এ লেখায় পাঠ অনুশীলন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই।

অধ্যয়নের এ যাবৎ কালের সর্বোন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন মনোবিজ্ঞানী Robinson। তিনি মানুষের মস্তিষ্ক বিশেষ করে স্মৃতি-বিস্মৃতি নিয়ে তাঁর জীবনে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তিনি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উপর গবেষণা করে অধ্যয়নের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর এ পদ্ধতিকে বলা হয় "Survey Q 3R" পদ্ধতি। অর্থাৎ Survey (জরিপ কর), Question (প্রশ্ন কর), Read(পড়), Recite(আবৃত্তি কর), Review(পর্যালোচনা কর)। পাঠ অনুশীলনের এ ক'টি ধাপ অনুসরণ করলে সহজে ভালো শিক্ষণ হতে পারে। পদ্ধতিটির ধাপ ক'টি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়-

Survey (জরিপ করা) : পাঠ অনুশীলনের সর্ব প্রথম ধাপ এটি। এ পর্যায়ে- (১) পড়তে বসে সর্ব প্রথম ক্লাস রুটিন অনুযায়ী সব পাঠ্যবিষয়গুলোর পরিমিতি নিতে হবে এবং প্রতিদিনের পাঠ তৈরির গুরুত্বানুযায়ী বিষয়গুলোকে সাজিয়ে নিতে হবে। এর সাথে সাথে পাঠ অনুশীলনের পরিমিতি নিয়ে বিষয়ভিত্তিক সময় বণ্টন করে নিতে হবে। (২) বিষয়ভিত্তিক পাঠ অনুশীলনের সময় আবার

বিষয়বস্তুটারও একটি পরিমিতি নিতে হবে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুটার কোন কোন দিক বা কি কি বিষয় শিখতে তা ঠিক করে নিতে হবে। মোট কথা এ পর্যায়ে একটা সুন্দর পাঠ-নকশা তৈরি করে নিতে হবে।

Question (প্রশ্ন করা) :

কোনো বিষয় শেখার সময় কে, কি, কেন, কিভাবে, কখন, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নবোধক শব্দ যোগে নিজে নিজেই ছোট ছোট প্রশ্ন তৈরি করে নিয়ে তার উত্তর শিখতে হবে তাহলে পাঠ্যবিষয় শেখার সময় নিজের বোধ ক্ষমতা (স্বীয় ধী শক্তি)র ব্যবহার হবে। তাহলে পাঠ্যবিষয়টা আত্মস্থ করতে সহজ হবে।

Read (পড়া) :

নিজে নিজে যে প্রশ্নগুলো তৈরি করা হল সেগুলোর উত্তর শেখার জন্য পাঠ্যবিষয়কে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে কোনো বিষয় স্মরণ রাখার জন্য বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে শেখা দরকার। অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ শিক্ষণ বিস্মৃতির প্রধান কারণ। এজন্য দৃঢ়ভাবে স্মৃতিতে ধরে রাখতে বিষয়বস্তুটির সম্যক অর্থ বা তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কোনো পাঠ্যবিষয়ের অর্থ না বুঝে তোতাপাখির মতো মুখস্থ করলে তা স্মৃতিতে থাকে না। গবেষণায় দেখা গেছে, অর্থহীন দূর্বোধ্য শব্দ মালার স্মৃতি যত তাড়াতাড়ি মুছে যায়, অর্থপূর্ণ বোধগম্য শব্দ মালার স্মৃতি তত তাড়াতাড়ি মুছে যায় না। আরেকটি বিষয় হলো বোধগম্য বিষয়বস্তু শিখতেও কম সময় লাগে। অর্থাৎ অর্থপূর্ণ বোধগম্য বিষয়বস্তুর শিক্ষণ ও স্মৃতি উভয়ই সহজতর হয়। পড়ার সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে, সেটা হল পাঠ্য বিষয়বস্তুর সামগ্রিক অধ্যয়ন (To study whole part of a lession at a time)। পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে বিষয়বস্তুকে খণ্ড খণ্ড ভাবে অধ্যয়ন করার চেয়ে সামগ্রিকভাবে বা পূর্ণাঙ্গরূপে অধ্যয়ন করলে বিষয়টি সহজে আত্মস্থ হয়।

Recite (আবৃত্তি করা) :

নীরবে পড়ার চেয়ে আবৃত্তি করে পড়া অনেক ভাল। তবে আবৃত্তি করে পড়ার সময় অবশ্যই উচ্চারণ সুস্পষ্ট হতে হবে এবং অন্যকে বিষয়টা বোঝানোর ধরনে আবৃত্তি করতে হবে। এ্যাঁ এ্যাঁ করে দ্রুত উচ্চারণে পড়ার বদভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

Review (পর্যালোচনা করা) :

বিষয়বস্তুটা শেখা শেষ হলে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে এতক্ষণ কি কি পড়লাম?, সব মনে আছে কি? এবং এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য পাঠ্যবিষয়টা স্মরণ করে পড়তে হবে। অর্থাৎ পাঠ্যবিষয়টা আরেকবার ভাল করে ঝালিয়ে নিতে হবে।

উত্তম পাঠ অনুশীলনের আনুসঙ্গিক আরো কিছু বিষয় আছে। সেগুলো হলো :

১। বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ করা :

কোনো একটা বিষয় শেখার পর সমগ্র পাঠ্য বিষয়বস্তুটার একটা সারসংক্ষেপ করে তা স্মরণে রাখার চেষ্টা করতে হবে। একটা বিষয় দীর্ঘকাল স্মরণ রাখার এটা একটা উত্তম পন্থা।

২। লেখা :

কোন পাঠ্য বিষয় শেখার শেষে কমপক্ষে একবার তা লিখে অনুশীলন করতে হবে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে Writing is better than reading. চীনা একটি প্রবাদ আছে :

I hear and I forget.
I see and I remember.
I do and I Know.

কোনা বিষয় পড়ার পর লেখাটাই হল 'Do'। অর্থাৎ পঠিত বিষয়টার হাতে কলমে শিক্ষা। কোনো বিষয় পড়ার পর লিখলে বিষয়টা সহজে স্মরণে থাকে। তাছাড়া হাতের লেখা সুন্দর হয় এবং দ্রুত লেখার অভ্যাস গড়ে উঠে। এজন্য কোনো বিষয় শেখার পর লিখতে আলস্য করা মোটেই ঠিক নয়।

৩। ভুল সংশোধন :

পাঠ্য বিষয়বস্তু শেখার শেষে লিখে অনুশীলনকালে নিজেই শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ভুলগুলো শনাক্ত করে তা সংশোধন করে নিতে হবে। তাহলে শিক্ষণ পরিপূর্ণ ভাবে সঠিক হবে এবং পরবর্তীতে ঐ ভুলগুলো আর হবে না এবং বিষয়টা স্মৃতিতে রাখতে সহজ হবে।

৪। বিশ্রাম :

কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় শেখার পর বিশ্রাম নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ কোনো একটা বিষয় শেখার পরক্ষণেই বিশ্রাম না নিয়ে আর একটা বিষয় পড়তে শুরু করা উচিৎ নয়। কিছু সময় অর্থাৎ পনের থেকে বিশ মিনিট বিরতি দিয়ে তারপর পড়তে হবে। একটানা পাঠে ক্লান্তি ও অবসাদ আসে, বিশ্রাম সেটা দূর করে। তা ছাড়া বিশ্রাম স্মৃতির জন্য সহায়ক। স্মৃতির জন্য সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা সবচেয়ে ভাল, তবে এই সময়ে চিত্তবিনোদনমূলক কিছু যেমন গানশোনা, টিভি দেখা, খেলা ইত্যাদি করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে :

বিশ্রাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা,
নয়নের অঙ্গ যেমন নয়নের পাতা।

৫। পাঠ তৈরির সুখানুভূতি :

একটা ভাল কাজ করার পর প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে এক ধরণের বর্ণনাতীত সুখানুভূতি বা নির্মল

আনন্দানুভূতি কাজ করে। এমনিভাবে একটা বিষয় সঠিকভাবে শেখার পর নিজের মনের মাঝে আনন্দানুভূতি বা সুখানুভূতির বোধ সৃষ্টি করতে হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে, নতুন নতুন বিষয় জানা বা শেখার মাঝে আনন্দ আছে। তাহলে লেখাপড়ায় মনোযোগ আসবে এবং নিয়মিত বই পাঠের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

৬। **পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্ত :**

শিক্ষার্থীদের কাউকে কাউকে পরীক্ষা শুরুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পড়াশোনা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, পরীক্ষা শুরুর ২ ঘণ্টা আগে থেকেই পড়াশোনা ত্যাগ করে নির্মল মানসিক বিশ্রামে থাকতে হয়। পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে ভয়শুন্য দূশ্চিন্তামুক্ত প্রফুল্ল চিত্তে থাকলে পরীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তর সহজে স্মরণে আসে।

৭। **পড়ার সময় :**

দিনে বা রাতের সব ভাগে আমাদের মন মেজাজ একরকম থাকে না। যেমন দিনের প্রথম ভাগে সকাল বেলা আমাদের মন ভালো থাকে আবার দিনের শেষ ভাগ অর্থাৎ গোধূলীতে মনটা কেন যেন বিষন্ন বিষন্ন লাগে। এজন্য দিনের প্রথম ভাগ অর্থাৎ ভোর বেলা পাঠাভ্যাসের উত্তম সময় এবং সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তকালে পাঠাভ্যাস মোটেই উচিৎ নয়। বরং তখন একটু খেলাধুলা করা বা বাইরে একটু ঘুরে বেড়ানো ভাল। তবে অধিক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করা উচিৎ নয়। গবেষণায় দেখা গেছে, রাতের পরিপূর্ণ নিদ্রা (Sound Sleep) পাঠ্যবিষয় উত্তমরূপে স্মরণে রাখতে সহায়তা করে।

৮। **পড়ার ঘর :** পড়ার ঘরটা বা রুমটা নিজস্ব বা আলাদা হলে ভালো হয়। আর ঘরটাতে যা কিছুই থাকুক না কেন সেগুলো যেন সাজানো গোছানো একটা পরিপাটিভাব থাকে। ঘরটার পরিবেশ এমন হবে যে ঘরটাতে ঢুকলেই মনটা প্রশান্তিতে ভরে উঠবে এবং নিজের কাছে মনে হবে এটা যেন একান্তই আমার আপন ভুবন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনো শিক্ষার্থী যদি এই পাঠ অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরণ করে পড়াশোনা করে তবে সে অবশ্যই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করবে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. মনোবিজ্ঞান ও জীবন, নীহাররঞ্জন সরকার, প্রকাশ কাল-১৯৯৫, নবম সংখ্যা, প্রকাশনীর নাম- জ্ঞানকোষ

চিন্তার টপোলজি

অধ্যাপক কে এম রব্বানী
অধ্যক্ষ, মোংলা সরকারি কলেজ

ভূমিকা

ভাষা এবং চিন্তা মানব অস্তিত্বের দুটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ভাষা শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে এবং কখনো কখনো সীমাবদ্ধও করে। ভাষা মানব সভ্যতার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি। ভাষার মাধ্যমে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করি, ধারণাগুলো বিনিময় করি এবং বাস্তবতাকে সংজ্ঞায়িত করি। এসকল বিবেচনায় বলা যায় চিন্তার টপোলজি ভাষা। তাই ভাষা এবং চিন্তার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বহুদিন ধরেই দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী এবং ভাষাবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে আসছেন।

এই প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করবো, ভাষা কীভাবে চিন্তাকে প্রভাবিত করে, চিন্তার সীমাবদ্ধতা তৈরি করে, সাংস্কৃতিক পার্থক্যের মাধ্যমে চিন্তার ধরন পরিবর্তন করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে চিন্তার পার্থক্যের কারণ হতে পারে।

১. ভাষা ও চিন্তার পারস্পরিক সম্পর্ক

১.১ ভাষার সংজ্ঞা ও কার্যক্রম

ভাষা হলো এমন একটি কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে মানুষ তাদের অনুভূতি, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে। ভাষার মধ্যে ধ্বনি, শব্দ, বাক্যগঠন, বোধগম্যতা এবং উপলব্ধির বিষয়গুলো থাকে।

১.২ চিন্তার সংজ্ঞা

চিন্তা হল মনের একটি জটিল প্রক্রিয়া যা অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, তথ্য, জ্ঞান, স্মৃতি ও যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয়। চিন্তার মাধ্যমে আমরা সমস্যা চিহ্নিত করি, সমস্যার বিশ্লেষণ করি, সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান নির্ধারণ করি, প্রয়োগ করি, ফলাফল পর্যবেক্ষণ করি, উন্নত সমাধানের জন্য পুনরায় একই প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য উত্তম সমাধান নির্ণয় করি ফলাফল পর্যবেক্ষণ করি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং নতুন ধারণা সৃষ্টি করি। একটু নতুন ধারণা মৌখিক লিখিত বা প্রায়োগিকভাবে প্রকাশ করি। এই যে প্রক্রিয়া এর সম্পূর্ণটিই ভাষার উপর নির্ভর করে সম্পন্ন হয়।

এটি বিভিন্ন ধাপে গঠিত হয় :

সংবেদন (Perception) : ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা।

অভিনিবেশ (Attention) : গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

স্মৃতি (Memory) : অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা।

যুক্তিবাদ (Reasoning): সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১.৩ ভাষা ও চিন্তার সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

ভাষা এবং চিন্তার সম্পর্ক নিয়ে বেশ কয়েকটি তত্ত্ব রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি তত্ত্ব হলো :

সাপির-ওরফ হাইপোথিসিস (Sapir-Whorf Hypothesis): এই তত্ত্ব অনুসারে, ভাষা মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে।

বিশ্বজনীন ভাষাগত তত্ত্ব (Universal Grammar): ভাষাগত তাত্ত্বিক নোয়াম চমস্কির মতে, ভাষা এবং চিন্তা উভয়ই মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং ভাষা চিন্তার উপর নির্ভরশীল নয়।

১.৪ ভাষা ও চিন্তা সম্পর্কে আরও মত :

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তার "Can the Subaltern Speak?" প্রবন্ধে ভাষা ও চিন্তা সম্পর্কে কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তার মতে, ভাষা হল চিন্তার মাধ্যম, কিন্তু ভাষা সর্বদাই নির্মিত। তিনি মনে করেন ভাষা নিরপেক্ষ নয়; ভাষা সামাজিক কাঠামো, ইতিহাস ও ক্ষমতার সম্পর্কের দ্বারা গঠিত। ফলে, আমরা যে ভাষায় চিন্তা করি তা নিজেই একটি ক্ষমতাগত অবস্থান ধারণ করে। ভাষা চিন্তাকে আকার দেয়, এবং একইসঙ্গে চিন্তার সম্ভাবনাকেও সীমাবদ্ধ করে।

১.৪.১ ঔপনিবেশিক ভাষা ও চিন্তার আধিপত্য :

তিনি দেখান, উপনিবেশিত জাতির চিন্তা ও পরিচয় ইংরেজি বা ইউরোপীয় ভাষার মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে, যা তাদের নিজস্ব কণ্ঠকে অবদমিত করেছে। যারা শাসিত, যারা প্রান্তিক তারা তাদের ভাষায় চিন্তা করলেও, বিশ্বমঞ্চে তাদের কথা বুঝতে বা মূল্যায়ন করতে পশ্চিমা ভাষা ও ছাঁকনির প্রয়োজন হয়। ফলে, তাদের "নিজস্ব" চিন্তাও এক অর্থে বিকৃত বা রূপান্তরিত হয়।

১.৪.২ 'সাবঅল্টার্ন' বা প্রান্তিকের ভাষাহীনতা :

তাঁর বিখ্যাত প্রশ্ন "Can the Subaltern Speak?" এর মধ্যেই আছে এই ধারণা– প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের ভাষায় কথা বললেও, আধিপত্যকারী কাঠামোর ভাষায় অনুবাদ না হলে তাদের বক্তব্য পৌঁছায় না। সুতরাং, ভাষা ও চিন্তার মধ্যকার সম্পর্ক এখানে একটি রাজনৈতিক প্রশ্নও হয়ে দাঁড়ায়।

১.৪.৩ চিন্তার স্বাধীনতার সীমা ভাষার মধ্যে নিহিত :

স্পিভাক মনে করেন, আমরা ভাষার বাইরে চিন্তা করতে পারি না- কারণ ভাষা আমাদের চিন্তার কাঠামো। যেহেতু ভাষা নিজেই একটি সামাজিক নির্মাণ, তাই চিন্তারও সামাজিক সীমা রয়েছে। অতএব, মুক্তচিন্তাও ভাষার ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার ভেতরে কাজ করে।

২. ভাষা কীভাবে চিন্তাকে প্রভাবিত করে?

২.১ শব্দভাণ্ডার ও চিন্তার সীমাবদ্ধতা

ভাষার শব্দভাণ্ডার চিন্তাধারার গঠন নির্ধারণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু আদিবাসী ভাষায় নির্দিষ্ট কিছু রঙের নাম নেই, ফলে তাদের রঙ সম্পর্কে উপলব্ধি অন্যদের থেকে ভিন্ন হতে পারে। যে ভাষায় যে শব্দ নেই সেই সম্পর্কিত ধারণা ওই ভাষার জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৈরি হয় না। এমনকি কোনো ভাষায় হারিয়ে যাওয়া কোনো শব্দ সম্পর্কে যে ধারণা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল সেই ধারণাও ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী উপলব্ধি করতে পারে না।

২.২ ব্যাকরণ ও যুক্তিবোধ

বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ কাঠামো চিন্তার ধরন পরিবর্তন করতে পারে। যেমন, চীনা ভাষায় কাল-নির্দেশক ক্রিয়াপদ কম ব্যবহৃত হয়, যা সময়ের ধারণার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আলাদা করে তোলে।

২.৩ সাংস্কৃতিক ভাষার প্রভাব

একটি ভাষার মধ্যে থাকা বিশেষ শব্দ ও অভিব্যক্তি তার সংস্কৃতির ধারণাকে প্রতিফলিত করে। যেমন, ইংরেজি ভাষায় “privacy” শব্দটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যা অন্যান্য ভাষায় অনুপস্থিত হতে পারে। ‘পান্তাভাত’ খাওয়া বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে ছিল। অনুরূপ শব্দ যদি কোনো ভাষায় না থাকে সেই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এই পান্তা খাওয়া সম্পর্কে কোনো ধারণাই করতে পারবে না। তবে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে মত ও ভাবের আদান-প্রদান সংঘটিত হলে উভয় ভাষায় নতুন শব্দ যুক্ত হয় অথবা পারস্পরিক আত্তীকরণ করে নেয় তখন উভয় জনগোষ্ঠী একই ধরনের চিন্তা করতে পারে। এভাবে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

৩. ভাষা ও বাস্তবতা উপলব্ধি :

৩.১ শিশুদের ভাষা শেখার প্রক্রিয়া ও চিন্তার বিকাশ

শিশুরা কীভাবে ভাষা শেখে এবং এটি তাদের চিন্তার বিকাশে কীভাবে প্রভাব ফেলে, তা বোঝা ভাষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩.২ শিশুদের ভাষা শিক্ষার স্তর

শিশুর ভাষা শিক্ষা সাধারণত চারটি স্তরে বিভক্ত :

ধ্বনি উপলব্ধি (Phonetic Perception) - জন্ম থেকে ৬ মাস শিশুরা সব ভাষার ধ্বনি চিনতে পারে। ৬ মাসের মধ্যে মাতৃভাষার নির্দিষ্ট ধ্বনির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

শব্দ ও বাক্য শেখা (Lexical Development) - ৬ মাস থেকে ২ বছর : শিশুরা এক শব্দের সরল বাক্য ব্যবহার শুরু করে (যেমন মা, বাবা, দাদা)। ১৮ মাস থেকে "টেলিগ্রাফিক স্পিচ" (যেমন "খাবার চাই") দেখা যায়।

ব্যাকরণ শেখা (Grammatical Development) - ২ থেকে ৪ বছর : শিশুরা সম্পূর্ণ বাক্য গঠন শেখে। ব্যাকরণগত নিয়ম প্রাকৃতিকভাবে আয়ত্ত করতে শুরু করে।

বর্ধিত ভাষাগত দক্ষতা (Advanced Language Skills) - ৪ বছর ও এর পর : শিশুরা ভাষার বিমূর্ত ধারণা বুঝতে শুরু করে। কাহিনী শুনে বুঝতে পারে এবং কিছু কিছু বলাও শেখে এবং জটিল বাক্য গঠন শেখে।

৩.৩ ভাষা শেখার ওপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব :

শিশুর ভাষা শেখা তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। যদি শিশুকে দ্বিভাষিক পরিবেশে বড় করা হয়, তবে তার বহুভাষিক চিন্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিশুর সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ভাষা শেখার হারকে ত্বরান্বিত করে।

৩.৪ ভাষার মাধ্যমে বাস্তবতা নির্মাণ :

আমরা যেভাবে বাস্তবতাকে দেখি, তার একটি বড় অংশ আমাদের ভাষার কারণে গঠিত হয়। যেমন, বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে সংখ্যা গণনার পদ্ধতি রয়েছে যা তাদের গণিত সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। মিশরীয় লিপি, ব্যাবিলনীয় লিপি, সুমেরীয় লিপি, ইনকা লিপি, ভারতীয় লিপিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতীক সংখ্যা এবং বর্ণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতীকগুলো সংশ্লিষ্ট সভ্যতার চেনাজানা পরিবেশ থেকে নির্বাচিত এবং আহরিত। প্রত্যেক অঞ্চলে আলাদা আলাদা সংখ্যা এবং গণনা পদ্ধতি চালু ছিল। বৈশ্বিকীকরণের ফলে অনেক প্রাচীন প্রতীক বিলুপ্ত হয়েছে। শক্তিশালী ভাষার প্রতীকগুলো দুর্বল ভাষার প্রতীকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনেক ভাষা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে। এখনো অনেক ভাষা বিলুপ্তির পথে। যে সকল ভাষা বিলুপ্ত হয়েছে সেই সকল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর উপলব্ধি এবং চিন্তার কাঠামো পরবর্তী কোনো ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারেনি। আক্ষরিক অর্থেই সেই অনুভূতিগুলোর এবং চিন্তা কাঠামোর মৃত্যু হয়েছে।

৩.৫ ভাষা ও স্মৃতি

গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ তার মাতৃভাষার ভিত্তিতে স্মৃতিচারণ করে। অর্থাৎ, যেভাবে ভাষার মাধ্যমে

আমরা অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করি, সেইভাবেই আমরা সেই অভিজ্ঞতাগুলো স্মরণ করি। এমনকি স্বপ্নে দেখা বিষয়গুলো নিজের ভাষার দ্বারা এবং ভাষাভিত্তিক চিন্তা কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাও তার ভাষা দ্বারা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩.৬ উপলব্ধির উপর ভাষার প্রভাব : আরবি ভাষায় একটি শব্দ আছে 'হুলিয়া'। শব্দের অর্থ কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা কোন দৃশ্যের অনুপুঙ্খ বাহ্যিক বিবরণ সংবলিত লেখা বা বর্ণনা যা শুনলে বা পড়লে ওই ব্যক্তি, বস্তু বা দৃশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ছবি মস্তিষ্কে চিত্রিত হয়ে যায়। যেমন, মহানবী (সা:) 'হুলিয়া মোবারক' বর্ণিত আছে। ভাষার আদান-প্রদানের ধারায় 'হুলিয়া' শব্দটি বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষীরা এই শব্দটির অর্থ একেবারে ভিন্নরূপে গ্রহণ করেছে যদিও তা একেবারে সম্পর্কহীন নয়। বিচারাধীন কোনো পলাতক ব্যক্তিকে ধরে আদালতে সোপর্দ করার অর্থে হুলিয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, অমুক ব্যক্তির নামে হুলিয়া জারি হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় পলাতক ব্যক্তির চেহারার বর্ণনা (অথবা স্কেচ) করে তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য জনসাধারণের উদ্দেশ্যে হুলিয়া জারি করা হতো। এখন আর চেহারার বর্ণনা দিয়ে হুলিয়া জারি করা হয় না, ছবি, নাম, ঠিকানাই যথেষ্ট। বাংলা ভাষার মধ্যেই হুলিয়া শব্দটির অর্থের অনেকাংশে বিবর্তন ঘটেছে। আর আরবি ভাষার অর্থগত দিকের সাথে মিলিয়ে দেখলে একেবারেই আলাদা উপলব্ধির জন্ম হবে মনে (মস্তিষ্কে)। এভাবেই শব্দ মানুষের চিন্তার উপরে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।

৩.৭ ভাষার মাধ্যমে চিন্তার চিত্রকল্প তৈরি :

ধরা যাক, ' সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে' অথবা 'একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু' বাংলা কবিতার দুটি বিখ্যাত লাইন। এই লাইন দুটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মনে যে চিত্রকল্প প্রস্ফুটিত করে, যে দেশে শিশির পড়ে না সে দেশের মানুষ এই চিত্রকল্প মস্তিষ্কে ধরতেই পারবে না। এরকম বহু উদাহরণ দেয়া যাবে।

৪. ভাষার পরিবর্তনের ফলে চিন্তার পরিবর্তন :

ভাষার বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তার ধরনও পরিবর্তিত হয়। নতুন নতুন শব্দ সংযোজন এবং সামাজিক পরিবর্তন ভাষার মাধ্যমে চিন্তাকে পুনর্গঠিত করে। প্রক্রিয়া সর্বদাই চলমান থাকে। একটি ভাষার রচিত মূল গ্রন্থ অন্য ভাষায় রূপান্তরের পর দেখা যায় উভয় ভাষার পাঠকের কাছে আলাদা আলাদা বোধ সৃষ্টি করেছে। অনুদিত ভাষার পাঠক মূল ভাবের কাছাকাছি যেতে পারে না। ফলে নিজের ভাষার চিন্তা কাঠামোর মধ্যে গ্রন্থের বক্তব্যকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে আত্মস্থ করে। এমনকি একটি ভাষার আদিরূপের পাঠ থেকে আধুনিক রূপে পাঠ একই বোধ সৃষ্টি করে না।

৫. উপসংহার

ভাষা ও চিন্তা একে অপরের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। ভাষা চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারে, চিন্তার গঠন নির্ধারণ করতে পারে এবং বাস্তবতা উপলব্ধির মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে। অনেকে হয়তো

ভিন্নমত পোষণ করবেন, তবে একথা স্পষ্ট যে, ভাষা মানব চিন্তাধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, ভাষা শুধু ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়, বরং এটি আমাদের চিন্তার কাঠামো তৈরি করে এবং সমাজের সাংস্কৃতিক মানদণ্ড গড়ে তোলে। অতএব, ভাষার বিকাশের সাথে সাথে আমাদের চিন্তার প্রসার ঘটানো এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান জানানো জরুরি। যে সকল ভাষা এখন বিলুপ্তির হুমকির মুখে আছে সে সকল ভাষার গল্পগুলো, কাহিনীগুলো, শব্দগুলো তুলে এনে বিভিন্ন ভাষায় সংরক্ষণ করা উচিত। না হলে সেই ভাষাভাষীর চিন্তা বিকাশের একটি ধারা কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। তাদের চিন্তাকাঠামোয় এমন বিষয়ে থাকতে পারে যে বিষয়গুলো ভবিষ্যৎ চিন্তার খোরাক যোগাবে।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত।

মানুষ কিভাবে শেখে?

আরিফুজ্জামান
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

আপনি কি কখনো ভেবেছেন মানুষ কিভাবে শেখে? কিভাবে মানুষ দক্ষতা অর্জন করে? সমস্যার সমাধান করে অথবা নতুন নতুন আবিষ্কার করে। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়া সামাজিকীকরণ সেটি কিভাবে ঘটে? মানুষ কেন অন্য প্রাণিদের চেয়ে ভিন্ন? মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?

এসবগুলো প্রশ্নের সহজ উত্তর হচ্ছে মানব সম্প্রদায়ের শিখন প্রক্রিয়া। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণির মাঝে মানুষের শিখন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং সহজাত। মূলত সামাজিকীকরণ বলতে যেটা বোঝায় সেটি মূলত মানুষের শিখন প্রক্রিয়ারই অপর নাম। সামাজিকীকরণ এর ধাপ ও সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি অবগত কিন্তু প্রকৃত অর্থে সামাজিকীকরণের মূল অর্থ হচ্ছে মানুষের শিখন প্রক্রিয়া। অর্থাৎ সামাজিকীকরণের যে ধাপগুলো আমরা জানি যেমন পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-স্কুল-কলেজ-বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি। কিন্তু সামাজিকীকরণের মূল বিষয় হচ্ছে মানুষ এই প্রতিটি ধাপ ও পর্যায়ে কিভাবে বিভিন্ন বিষয় শিখে থাকে। আজকে চলুন আমরা দেখে আসি মানুষ কিভাবে শেখে অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে মানুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমগুলো জেনে আসি।

মানুষের এই শিখনকার্যক্রম কেন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ? এর প্রয়োজনীয়তা কী?

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? এই প্রশ্নে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা অর্থাৎ মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকে মানুষের সুকুমার বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। মানুষকে যুক্তিবাদী, মননশীল, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং মেধা-মনন, যোগ্য ও দক্ষ মানুষ তৈরি করা। সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানুষ তৈরি করা।

সেই মানুষ তৈরি করা যে বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্য, সমাজের, পরিবার ও রাষ্ট্রের উপযোগী। সেই মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক ও সৃষ্টিশীল, প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন। সুন্দর, সুস্থ ও যোগ্য মানুষ গড়ে তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য। কেবল মানুষকে পড়তে বা লেখাতে শেখা নয় বরং মানুষের ভিতরে যে সুপ্তপ্রতিভা রয়েছে, সুকুমার বৃত্তি রয়েছে তার বিকাশ ঘটানো।

সুতরাং শিক্ষার এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে গেলে (যা কিনা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মূল হাতিয়ার)

অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করতে গেলে, মানুষকে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, দক্ষ ও যোগ্য মানুষ তৈরি করতে গেলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি হল মানুষের শিখন কার্যক্রম ও প্রক্রিয়ার উন্নয়ন। অর্থাৎ মানুষ যেভাবে শেখে, সেই শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন।

মানুষ যেভাবে শেখে, এই শেখার মাঝেই রয়েছে মানুষকে মানুষ হিসেবে তৈরি করতে পারা অথবা না পারার দক্ষতা। এই শিখনপ্রক্রিয়ার মাঝেই রয়েছে সুস্থ সাংস্কৃতিক বোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে পারা, সমাজের, রাষ্ট্রের চাহিদা সম্পন্ন মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে পারা অথবা না পারা।

কেন এ কথা বলছি? চলুন দেখে আসি মানুষ কিভাবে শেখে?

মানুষের শিক্ষা মূলত দুই ধরনের। প্রথমটি হচ্ছে instinctive বা সহজাত এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে learned বা অর্জন।

সহজাত (Instinctive)

মানুষ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ জন্মের সাথে সাথেই সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত যে জ্ঞান বা শিক্ষা তার জিনগত বৈশিষ্ট্য থেকে পেয়ে থাকে সেটি হচ্ছে সহজাত।

জন্মের সাথে সাথেই সে কিছু মৌলিক জ্ঞান সাথে নিয়ে আসে। জন্মের সাথে সাথেই তার মাঝে কিছু বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। একটি মানব শিশু অথবা পশু শাবক জন্মের পরপরই উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে এবং মাতৃদুগ্ধ পান করার চেষ্টা করে (sucking)।

জন্মের পরপরই মায়ের স্তন চুষে দুধ খেতে চাওয়া, দাঁড়াতে চেষ্টা করা, মানব শিশুর হাসি, কান্না, ভয় এসব কিছুই তার সহজাত শিক্ষা।

সহজাত শিক্ষার বাইরে মানুষ কিভাবে শেখে ও জীবন-দক্ষতা অর্জন করে চলুন তাই দেখে আসি। মানুষের আনুষ্ঠানিক (প্রাতিষ্ঠানিক) ও অনানুষ্ঠানিক শিখনের মৌলিক প্রক্রিয়াগুলো একই। যেমন:

ক. দর্শন/দৃষ্টি/দেখা (Sight)
খ. শ্রবণ/শোনা (Hearings)
গ. অভিজ্ঞতা (Experiences)
ঘ. গবেষণা (Research)
ঙ. সম্পর্কযুক্তকরণ (Correlations)
চ. স্পর্শ ও ঘ্রাণ (Sense of Touch & Smells)
ছ. ইন্দ্রিয় ও বিবেক (Sense, Intuition & Conscience)
জ. মুখস্থকরণ (Memorizing)

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও মানুষ কিভাবে তার শিখন দক্ষতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পারে আমরা

তা দেখব–

দর্শন/দৃষ্টি/দেখা (Sight)

কবি সুনির্মল বসু একটি কবিতার ছত্রে বলেছেন–

“বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র
নানান ভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র।”

শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিনিয়ত ও প্রতিটি মুহূর্তে বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নতুন নতুন বিষয় শিখতে থাকে। মানুষের জীবনব্যাপী এই শিখন প্রক্রিয়ার অধিকাংশ হয়ে থাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক। প্রতিনিয়ত আমরা নতুন নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির মুখোমুখি হই এবং সেখান থেকে শিখি। মানুষ সব থেকে বেশি শেখে দর্শন/দৃষ্টি/দেখে। শিশুদের ক্ষেত্রে যাকে আমরা বলি অনুকরণ। এই শিখনপ্রক্রিয়া শিশুর ক্ষেত্রে অনুকরণ কিন্তু পূর্ণবয়স্ক ও সচেতন মানুষও একইভাবে শিখে থাকে তবে সেটা তাদের নিজস্ব স্বভাবসুলভ প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ বলে আমরা তাকে সরাসরি শিশুদের মতো অনুকরণ বলতে পারি না তবে শিখন প্রক্রিয়া একই। বড়দের ক্ষেত্রে যারা প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়মতান্ত্রিক শিখনপ্রক্রিয়ায় শিক্ষিত ও সচেতন তাদের সাথে সাধারণের উল্লিখিত শিখনপ্রক্রিয়ার পার্থক্য হল শুধু পরিশীলিতার ক্ষেত্রে। সুতরাং এই শ্রেণীর ক্ষেত্রে শিখনের বহিঃপ্রকাশ বেশ পরিশীলিত হয়।

দর্শনের (দেখে শেখার) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ (Expressions/ Bodz language/Movement)। এর মাধ্যমেও মানুষ শিখে থাকে। এর মাধ্যমে সে অন্যের ভাব ও মনোভঙ্গি বুঝতে পারে এবং এর মাধ্যমে নিজেরও ভাব ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। এভাবে মানুষ শিখে থাকে।

মানুষ সব থেকে বেশি শেখে দেখে। মানুষ তার জন্মের পর তার মায়ের কাছ থেকে যা দেখে সবকিছু শিখতে থাকে। মায়ের কথা বলার ধরন, নতুন নতুন শব্দ চয়ন, ভাষা, অনুভূতি, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, অনুভূতি প্রকাশের শারীরিক ভঙ্গিমা, হাসি, কান্না সবকিছু। একটি শিশু জন্মের পর তার চারপাশ দেখতে থাকে আর অবচেতন মনেই শিখতে থাকে। মানুষের সে যাত বড় হতে থাকে চারপাশে বস্তুজগত দেখে তার শেখার পরিধি ততই বাড়তে থাকে। একসময় মা, তারপর বাবা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, পরিবেশ ও রাষ্ট্র। মানুষকি শুধু শিশু বয়সেই শেখে? এর উত্তর হচ্ছে, না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ প্রতিনিয়ত শিখতে থাকে। সে তার চারপাশে যত কিছু দেখে সবকিছু থেকেই সে শিখতে থাকে। এটি বড়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য অর্থাৎ আমরা নিজেরাও সবসময় আমাদের পরিবেশ, সমাজ, বন্ধু অথবা নতুন যখন জায়গায় যাই সব জায়গা থেকেই আমরা শিখতে থাকি। গভীরভাবে চিন্তা করলে একথা নিশ্চিতভাবেই প্রতিপাদ হবে যে, আমাদের শিক্ষা-শিখনের অর্থাৎ আমরা যা শিখি ও অভিজ্ঞতা লাভ করি, আমাদের শিখনের, আমাদের জানাশোনার বড় অংশ জুড়েই রয়েছে আমদের দর্শন অর্থাৎ আমরা চারপাশে যা দেখি। দেখে শেখার ও গবেষণা করার দুটি প্রকার রয়েছে। একটি

হচ্ছে– Subjective অপরটি হচ্ছে Objective। মানুষ দেখে, কল্পনা করে এবং শেখে। একইসাথে মানুষ কল্পনায় চিন্তা করে যা সে দেখেনি তারপর সেটাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার চেষ্টা করে। যাইহোক আমরা এ বিষয়ের দিকে গভীরভাবে যাব না। আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে মানুষের শিখন অর্থাৎ মানুষ কিভাবে শেখে, জ্ঞান আহরণ করে, মানুষ কিভাবে তার মূল্যবোধ তৈরি করে এবং সমাজে এই শিখনের গুরুত্বটা কোথায়, সেটি নিয়ে।

আমরা বর্তমানে যে সমাজে বাস করছি সে সমাজ বর্তমানে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের বড়ই অভাব। মানুষের মধ্যে এখন মানুষের প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা দায়িত্বশীলতা, সৃষ্টিশীলতা, দেশের প্রতি ভালোবাসা, হিংসা-বিদ্বেষ ও পক্ষপাতহীন যে সমাজ আমরা কল্পনা করি, যে মানুষ আমরা কল্পনা করি সেই মানুষ আমরা গড়ে তুলতে পারিনি, পারছি না। কারণ আমরা যা দেখে শিখে থাকি, চারপাশে যা দেখছি, আমরা নিজেরাও আমাদের অজান্তে তেমন হয়ে যায়। আমাদের সন্তানেরা ঠিক তেমনি বেড়ে উঠে। আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি পরিবার সমাজ এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দুর্নীতি, বৈষম্য। অবিচার-অনাচার ও ন্যায়হীনতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই দুর্নীতি, বৈষম্য, অবিচার-অনাচার ও ন্যায়হীনতা মানুষের শিখন ও মনস্তত্ত্বকে নেতিবাচকভাবে ব্যাপক প্রভাবিত করে।

শ্রবণ/শোনা (Hearing)

মানুষের শিখন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে শ্রবণ বা শোনা। মানুষ যেমন সতত সর্বদা দর্শন/দেখে থাকে ঠিক তেমনি শুনেও থাকে। দর্শনের (দেখার) মাধ্যমে শিখনে মানুষ বস্তুগত জিনিস দেখে এবং তদানুযায়ী তার নাম, আকার আকৃতি, প্রকৃতি ও কার্যকারণ উদঘাটনে তাঁর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটে। আবিষ্কার উদঘাটন বা কার্যকারণ নির্ণয়ে তাই দর্শনের (দৃষ্টির মাধ্যমে দেখার) ভূমিকাই মুখ্য। আবার চিন্তন প্রক্রিয়া দর্শনের মাধ্যমেও ঘটে থাকে। তাই বলা যায় দর্শন দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং তার থেকে যে চিন্তার সূত্রপাত এ দুইয়ের মাধ্যমে মানুষ বিচিত্র জ্ঞান লাভ করে মাসিকে থাকে।

তবে দর্শনের (দৃষ্টির মাধ্যমে দেখে শেখার) বিষয়টি পূর্ণতার পায় না শ্রবণপ্রক্রিয়া ছাড়া। সুন্দর ঝর্নার দৃশ্য ও কলকল শব্দে তার ঝর্নাধারা প্রবাহিত হওয়ার দৃশ্য মানুষের মনকে আনন্দে উদ্বেলিত করে। মনকে পরিতৃপ্ত করে। ঝর্নার কলকল ধ্বনি না থাকলে, বসন্তে কোকিলের গুনগুন গান না থাকলে, গানের সুমিষ্ট সুর আর বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ না থাকলে মানুষের মন কখনো শান্ত আর তৃপ্ত হতো না। প্রাকৃতিক অপার সৌন্দর্যের সুধা সে পরিপূর্ণভাবে লাভ করত না। দর্শনের (দৃষ্টির) মাধ্যমে মানুষ যা দেখে শ্রবণের মাধ্যমে তার সেই দেখার পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ মানুষ শ্রবণের মাধ্যমে শিখে থাকে। শ্রবণ দর্শনকে পূর্ণতা এনে দেয়।

শ্রবণের বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাষার ক্ষেত্রে। ভাষাকে অর্জন ও শেখার ক্ষেত্রে শ্রবণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রবণের (শব্দের অনুরণন) ভূমিকা এতটাই বেশি যে শ্রবণ/শব্দ না থাকলে মানুষ যোগাযোগের শক্তি হারিয়ে ফেলত। কারণ মানুষ ভাষা শেখে শুনে শুনে মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে বলে বলে। দর্শনের (দৃষ্টির মাধ্যমে দেখা) ও শ্রবণের (শোনার) উভয়টি একসাথে ঘটলে মানুষের শিখনের

পূর্ণতা পায়। আর এ দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ শেখে ও একইসাথে ভাষাকে আত্মস্থ করে।

অভিজ্ঞতা (Experiences)

মানুষ সামাজিক জীব। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ও প্রতিটি সময়ে সে বিশ্বচরাচরে বৈচিত্র্যময় ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী হয়। প্রতিনিয়ত সে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে একে অপরের সাথে যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একে অপরের সাথে ভাববিনিময় করে থাকে। মানুষ তার আবেগ, অনুভূতি ভাবনা-চিন্তা, দর্শন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি অর্থনীতি ব্যাবসা বাণিজ্য অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি বিষয় একে অপরের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে থাকে। এভাবে মানুষ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। মানুষের এই অন্তঃসম্পর্কিত ও আন্তঃসম্পর্কিত মিথস্ক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় আর এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারে ও শিখতে থাকে।

তার এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সর্বদা অপ্রাতিষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই মানুষ সবচেয়ে বেশি শিখে থাকে। নতুন নতুন সমস্যা ও সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়ে সে। সমস্যা থেকে উত্তরণে এজন্য নিজেকে নিয়োগ করে সম্ভবনাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে চায়। এভাবেই উদ্ভাবিত হয় নতুন আবিষ্কারের নতুন প্রযুক্তির, সৃষ্টি হয় নতুন জ্ঞান। আবার একই সাথে সম্পূর্ণ নতুন নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সে ফিরে যায় তার পিছনের অভিজ্ঞতার দিকে এবং সে আলোকে চেষ্টা করে সমস্যা থেকে উত্তরণের। তাই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়া হয় দীর্ঘমেয়াদী ও অবিনশ্বর।

গবেষণা (Research)

মানুষের শিখন প্রক্রিয়ার সুসংঘটিত ও সুসংবদ্ধ রূপ হচ্ছে গবেষণা। গবেষণার মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়া হচ্ছে সর্বাংশে আনুষ্ঠানিক ও নিয়ম সিদ্ধ লক্ষণের উপর গবেষণার মাধ্যমে মানুষ নতুন নতুন আবিষ্কার করে থাকে। একটি নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে চিন্তা ও প্রয়োগিক পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের শিখন প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে গবেষণা। নতুন জ্ঞান সৃষ্টির প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হচ্ছে গবেষণা।

সম্পর্কযুক্তকরণ (Correlation)

মানুষের মস্তিষ্ক ভীষণভাবে ক্রিয়াশীল। মানুষের শিখন বা শেখা অধিকাংশ ঘটে তার মস্তিষ্কের সম্পর্কযুক্তকরণ থেকে। মানুষ প্রতিনিয়ত চেতন ও অবচেতন মনে কোনো একটি ঘটনার সাথে অন্য আরেকটি ঘটনা বা বিষয়ের সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য খুঁজতে থাকে। এভাবে চেতন ও অবচেতন মনে যখন সে কথা বলে অথবা একাকী চুপ থাকে। মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল থাকায় তখনো সে বিচিত্র বিষয়ের ভাবনা থেকে শিখতে থাকে। সে নিজেকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কল্পনা করে এবং তার একটি বিমূর্ত রূপ কল্পনা করে, নিজেকে প্রশ্ন করে এবং এরূপ পরিস্থিতিতে তার করণীয় কী তা নির্ধারণ করে। এভাবে মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যাপকভাবে শিখতে থাকে। তবে এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক ও বিমূর্ত প্রক্রিয়া।

এর একটি মূর্ত প্রক্রিয়া হচ্ছে বিতর্কের মাধ্যমে যুক্তি উপস্থাপন। মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়াও এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত।

স্পর্শ ও ঘ্রাণ (Sense of Touch & Smell)

মানুষের শিখনপ্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী অনুসঙ্গ হলো স্পর্শ ও ঘ্রাণ। বাইরের বস্তু সম্পর্কে জানার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে স্পর্শ ও ঘ্রাণ।

স্পর্শ ও ঘ্রাণের মাধ্যমে যিনি চোখে দেখেন না অথবা শ্রবণ প্রতিবন্ধী সেও শিখতে পারেন।

ইন্দ্রিয় ও বিবেক (Sense, Intuition & Conscience)

আচ্ছা, মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা কী? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, মানুষ তার পঞ্চইন্দ্রিয়, অভিজ্ঞতা, গবেষণা, সম্পর্কযুক্তকরণ করা, মুখস্ত বা চিন্তার মাধ্যমে যা শিখে তার সাথে যখন তার বিবেক ও প্রজ্ঞার যৌক্তিক সিদ্ধান্তের মেলবন্ধন হয় তখন সেটি সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা হয়। মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা হচ্ছে যা মানুষ বিভিন্নভাবে শিখে এবং যখন সেটি বিবেক দিয়ে উপলব্ধি বা যৌক্তিকরণ যাচাই করে। এটিই আদর্শ শিখন। এই আদর্শ শিখন ছাড়া মানুষের শিখন মানবজাতির জন্য কল্যাণকর নাও হতে পারে। সুতরাং বলা যায় মানুষের পুরো শিখনপ্রক্রিয়ার পূর্ণতা দেয় তার বিবেক।

মুখস্থকরণ (Memorizing)

মানুষের শিখন প্রক্রিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বা প্রক্রিয়া হলো মুখস্থকরণ। মানুষ স্বভাবতই অনেক কিছু মুখস্থ করে বা মনে রাখে। এভাবে মানুষ শিখে থাকে। তবে অপরাপর শিখন প্রক্রিয়া থেকে মুখস্তকরণ প্রক্রিয়ার দীর্ঘস্থায়িত্ব ও প্রভাব সীমিত। সময়ের সাথে সাথে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়। মানুষ বিস্মৃতিপ্রবণ।

প্রিয় পাঠকমণ্ডলী, আমি এতক্ষণ মানুষের শেখার যে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছি এই সবগুলো প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যখন মানুষের শিখন প্রক্রিয়া চলতে থাকে তখন আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মানুষের এই পুরো শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। আর তা হলো– তার পরিবেশ।

মানুষের শিখনপ্রক্রিয়া যে পরিবেশে ঘটে অর্থাৎ মানুষ যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে যেমন পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল; সবকিছু দ্বারা ব্যাপকভাবে সে প্রভাবিত হয়। উল্লিখিত এই মানব ও প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি সুন্দর ও সুশৃংখল না হয় তবে মানুষের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠা, সুন্দর শিখনপ্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। যদি কোনো মানুষ দুর্নীতির, সন্ত্রাস অনিয়মমুক্ত নির্মল সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে সুস্থ-সাংস্কৃতিক ধারায় পরিচালিত মূল্যবোধসম্পন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠে তবে তার শিখন প্রক্রিয়াও হয় সুস্থ, সুন্দর ও নির্মল। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসাবে সে গড়ে ওঠে। সুতরাং সমাজের আচরিত ধর্ম, কৃষ্টি-কালচার, শিক্ষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ মানুষের শিখন প্রক্রিয়ার মূল নিয়ামক।

সুতরাং আমাদেরকে মানুষের সুন্দর শিখনপ্রক্রিয়ার জন্য সুন্দর, মানবিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

মানবশিশু যেমন দেখে, যেমন শুনে, যেমন পরিবেশের মধ্য দিয়ে সে বেড়ে ওঠে তার শিখনও ঠিক তদ্রূপ হয়। সুন্দর পরিবেশে, সুন্দর আচরণের ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠলে মানবশিশু সুন্দর আচরণের অধিকারী হয়। মানব শিশু পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে যেরূপ ব্যবহার পেয়ে থাকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রও তার কাছ থেকে ঠিক তেমনি ব্যবহার পেয়ে থাকে। সুতরাং মানুষের উল্লিখিত এই শিখনপ্রক্রিয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর উন্নয়নে আমাদের নিজেদেরকে ব্যাপৃত করতে হবে।

ডিসক্যালকুলিয়া : গণিতের ভয় নাকি রোগ?

বিশ্বজিৎ মন্ডল
প্রভাষক, গণিত বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

ধরুন, আগামীকাল আপনার গণিত পরীক্ষা। আগের রাতে বা আগের কদিন প্রচণ্ড চাপ ও উদ্বেগ অনুভব করছেন। অথবা গণিতের মৌলিক ধারণাগুলো বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। সমস্যা দুটির সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীই পরিচিত। দুটি সমস্যা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও একেবারে ভিন্ন বিষয়।

ছাত্রজীবনে আমরা অনেকেই কম বেশি গণিতের প্রশ্ন সমাধানে সমস্যার মুখে পড়েছি। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই যুদ্ধ জয় করে মানসিক বিকাশে এগিয়ে গেছে, আবার কেউ কেউ মৌলিক ধারণাগুলো বুঝতেও কঠিন সংগ্রাম করেছে এবং করছে। একজন শিক্ষার্থীর জন্য গণিতের ক্লাসে কঠিন সময় কাটানোর পেছনে কেবল উদ্বেগই কি দায়ী, নাকি এর পেছনে রয়েছে কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাগত প্রতিবন্ধকতা?

একটু পেছনে ফিরে যাই। শৈশব থেকেই আমরা প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা অর্জন করেছি বা করি। কেউ কেউ শুরু থেকেই পড়াশোনায় দক্ষতা অর্জন করে। অন্যদিকে অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও নিয়মিত অনুশীলনের পরেও কিছু শিক্ষার্থী গণিতে যথাযথ উন্নতি করতে পারে না। এর পেছনে কখনো কখনো দায়ী একটি বিশেষ রোগ– ডিসক্যালকুলিয়া। এই বিশেষ সমস্যায় আক্রান্ত শিক্ষার্থীরা গণিতের মূল নীতিগুলো বুঝতে পারে না। তাদের মধ্যে কারও কারও গাণিতিক সমস্যা সমাধানের পরবর্তী পদক্ষেপ কী, সে ধারণা থাকতে পারে; কিন্তু এই পদক্ষেপগুলো কেন গ্রহণ করা হচ্ছে, তারা তা বুঝতে পারে না। এটি একটি নিউরো-কগনিটিভ সমস্যা।

গণিত-উদ্বেগ বা গণিত নিয়ে উদ্বেগ আর ডিসক্যালকুলিয়া অবশ্য ভিন্ন জিনিস। যাদের গণিত-উদ্বেগ থাকে, তারা ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার পরও গণিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আগে ভয় পেয়ে যায়। শুধু পরীক্ষাই নয়, গণিত শেখা, এমনকি গণিত সম্পর্কে চিন্তা করাও কঠিন হয়ে পড়ে তাদের জন্য। এটিকে গণিতের এক ধরনের নেতিবাচক মানসিক প্রতিক্রিয়া হিসাবেও বর্ণনা করা হয়। গণিত-উদ্বেগযুক্ত শিশুরা প্রায়ই নিজস্ব ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে, যদিও তারা গাণিতিক ধারণাগুলো বোঝে। এই ভীতি তাদের মধ্যে মানসিক চাপ তৈরি করে। শিশুদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দেয় এবং প্রায়ই তাদের গণিত-সম্পর্কিত কোনো কিছুতে অংশ নিতে বাধা দেয়।

ডিসক্যালকুলিয়া একটি শিখনজনিত সমস্যা। আর গণিতের উদ্বেগ একটি উদ্বেগজনিত সমস্যা।

তাহলে, দুটোর পার্থক্য কী? আগেই বলেছি, দুটো ভিন্ন জিনিস। কেউ কেউ হয়তো এটুকু পড়ে কিছু পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন, আবার অনেকে হয়তো পার্থক্য ধরতে পারেননি। বিষয়টা একটু খোলসা করা যাক।

লক্ষণগুলো কিছুটা একই রকম মনে হলেও ডিসক্যালকুলিয়া এবং গণিতের উদ্বেগ– দুটি আলাদা সমস্যা। ডিসক্যালকুলিয়া একটি নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার। সংখ্যা এবং গাণিতিক ধারণা বোঝা ও ব্যবহার করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এ রোগ। ধরুন, আপনি একজন কাঠমিস্ত্রি। আপনার সরঞ্জামগুলো ত্রুটিপূর্ণ। আপনি যে কাজটি করছেন, সেটি ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতির কারণে সঠিকভাবে করতে পারছেন না। ফলে সঠিকভাবে কাঠামো তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়ছে। একইভাবে ডিসক্যালকুলিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য মৌলিক গাণিতিক ধারণাগুলো বোঝা এবং সেগুলো ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করা কঠিন হতে পারে।

অন্যদিকে গণিতের উদ্বেগ মানে গণিত সংক্রান্ত ভীতি। চরম উদ্বেগ। আগেই যেমন বলেছি, এর কারণে গণিত শেখা, এমনকি গণিত সম্পর্কে চিন্তা করাও কঠিন হয়ে পড়ে। এটা ভালোভাবে বুঝতে এমন একজন কাঠমিস্ত্রির কথা কল্পনা করুন যে ভুল করার ভয়ে নতুন প্রকল্প শুরু করতে দ্বিধা করছে। অর্থাৎ দক্ষতা থাকলেও সেটা কাজে লাগাতে পারছে না। পেছনে কলকাঠি নাড়ছে ব্যর্থতার ভয়। অর্থাৎ ডিসক্যালকুলিয়া একটি শিখনজনিত সমস্যা। আর গণিতের উদ্বেগ একটি উদ্বেগজনিত সমস্যা। প্রথমটির জন্য গাণিতিক ধারণা বোঝার ক্ষমতা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। দ্বিতীয়টির জন্য গণিত বোঝার ক্ষমতায় কোনো প্রভাব পড়ে না, তবে গণিত সম্পর্কিত আবেগ প্রভাবিত হয়। তবে দুটিই শিক্ষা এবং জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

তাহলে প্রশ্ন আসে, এসব সমস্যা মোকাবিলার উপায় কী?

প্রথমে ডিসক্যালকুলিয়ায় আক্রান্তদের ক্ষেত্রে কী করা যায়, তা বলি। এখানে দুটো দিক– একটি পারিবারিক, আরেকটি আক্রান্ত ব্যক্তি নিজে কী করতে পারেন।

শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করার বদলে বোঝার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কৌতূহলী হতে হবে। জিজ্ঞাসা করতে হবে, 'কেন' একটি গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ধরুন, এমন একজন শিক্ষার্থী, যে সব বিষয়ে খুব ভালো, কিন্তু গণিতে অত্যন্ত খারাপ। বারবার চেষ্টা করার পরেও গাণিতিক দক্ষতায় কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। বাবা-মা এবং শিক্ষকেরা অমনোযোগী এবং অলস বলে দোষারোপ করছে। এ ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হলো, সচেতনতার অভাব। পরিবার ও শিক্ষকদের বুঝতে হবে, শিক্ষার্থী ডিসক্যালকুলিয়াতে ভুগছে। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে। আমাদের একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে এ ধরনের শিক্ষার্থীরা নির্ভরতার সঙ্গে নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারে।

আর শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করার বদলে বোঝার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কৌতূহলী হতে হবে। জিজ্ঞাসা করতে হবে, 'কেন' একটি গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। শুধু পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্ভর না করে বিভিন্ন খেলা, দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে গাণিতিক ধারণাগুলো শেখার চেষ্টা করা যেতে পারে। বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এসব ধারণা প্রয়োগ করলে শেখা পোক্ত হবে। এগোতে হবে নিজের গতিতে। প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে হবে, ভয় পাওয়া যাবে না।

এবারে বলি, যাদের গণিত-উদ্বেগ আছে, তারা কী করতে পারে। প্রথমেই, আশাবাদী হতে হবে। ভুল করাটা কোনো সমস্যা নয়। ব্যর্থ না হলে আপনি কীভাবে সফলতার ফলপ্রসূতা জানবেন? প্রয়োজনে ঘন ঘন বিরতি নিন এবং বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে ধীরে ধীরে শিখুন। নিজেকে চাপ দেবেন না। সম্ভব হলে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যের সঙ্গে গাণিতিক ধারণাগুলো সংযুক্ত করুন, এর ব্যবহারিক প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে নিন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নিজের মধ্যে বিশ্বাস রাখা। গণিতের ভয় কাটিয়ে ওঠা বা শেখার ব্যাধির উন্নতি করা বর্তমানে অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। তবে এটুকু মাথায় রাখতে হবে যে সামনে আরও ভাল দিন আসবে। আর প্রয়োজনে সাহায্য নেওয়াটা কোনো দোষ নয়। তা ছাড়া, আপনি তো একা নন! মনে রাখবেন, সময় এবং আপনার আশপাশের মানুষের সমর্থন ও সহায়তায় এ ভয় আপনি শিগগিরই কাটিয়ে উঠবেন। হয়তো ধীরে ধীরে গণিতে আনন্দও পাবেন।

সমাজকর্ম শিক্ষা

রঞ্জিতা মন্ডল
প্রভাষক সমাজকর্ম, মোংলা সরকারি কলেজ

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত নানা জটিল ও বহুমুখী সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক সমাজকর্মের উদ্ভব। এ পেশার সূচনা ইংল্যান্ডে হলেও পরিপূর্ণতা লাভ করে আমেরিকায়। অর্থাৎ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার অবদান সবচেয়ে বেশি। পেশার বিকাশে শিক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়ে সমাজকর্মকে একটি পরিশোধিত রূপদানে এ দুটি দেশের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতে চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমাজকর্ম শিক্ষার ব্যাপকতা লাভ করে।

সমাজসেবার প্রথম সূত্রপাত ঘটে ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ডে মূলত বিশ শতক থেকে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রবর্তন ঘটে। মধ্যযুগে গির্জার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে গরিব দুঃখী এবং পঙ্গুদের সেবা করা হতো। এ সেবাদান ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে সরকারি সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে আমেরিকার অবদান সবচেয়ে বেশি। মূলত আধুনিক সমাজকর্মের জ্ঞান ও শিক্ষা আমেরিকারই অবদান। সমাজকর্ম শিক্ষার প্রবর্তনে এনা এল ডয়েস সর্বপ্রথম সমাজসেবায় পেশাগত প্রশিক্ষণদানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সমাজসেবার উপর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণদানের জন্য ১৮৯৭ সালে ম্যারি রিচমন্ড 'Training School for Applied Philanthropy' স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে তিনি 'দান সংগঠন সমিতি' এবং উক্ত স্কুলগুলোর যৌথ উদ্যোগে ১৮৯৮ সালে নিউইয়র্ক শহরে সমাজকর্মের উপর ছয় সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেন। এ কোর্সের মাধ্যমে আমেরিকায় সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪০ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬৩ সালে 'New York school of Social Work ' নাম পরিবর্তন করে 'Columbia University School of Social Work' রাখা হয়।

ইংল্যান্ড ও আমেরিকার পরে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অস্ট্রেলিয়াতে। অস্ট্রেলিয়াতে ১৯২৯ সালে প্রথম সমাজকর্মের ওপর প্রশিক্ষণ কর্ম পরিচালনা করা হয়। ১৯৫৭ সালে 'Murry Report' সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য, রাজ্য সরকারের মঞ্জুরি এবং অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের

সাহায্যপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সমাজকর্ম বিষয়ে যেসব কোর্স ও যে ধরনের শিক্ষা চালু রয়েছে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো এমন গ্রাজুয়েট তৈরি করা যারা যেকোন বিষয় বা 'পরিস্থিতিকে জটিল বা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবে।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক সমাজকল্যাণের সূচনা হয়েছিল আমেরিকান মিশনারিদের মাধ্যমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান মিশনারিরা সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভারতে আসে। ১৯২৫ সালে Clifford Manshardt নামক একজন আমেরিকান খ্রিস্টান ধর্মযাজক American Marathi Mission এর মাধ্যমে ভারতে আসেন এবং বোম্বে শহরের বিভিন্ন বস্তি এলাকায় জনগণের অবস্থার উন্নয়নে বেশকিছু কর্মসূচি পরিচালনা করেন। কিন্তু বোম্বের শিল্পায়িত অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে উক্ত ধর্মযাজক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ' স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্টের' সহায়তায় Clifford Manshardt ১৯৩৬ সালে বোম্বেতে 'Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Work' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সমাজকর্ম কোর্স চালু হলে এ স্কুলটির নাম পরিবর্তন হয়ে Tata Institute of Social Science নামে পরিচিতি হয়। সমাজকর্ম শিক্ষার জন্য দ্বিতীয় ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় লক্ষ্ণৌতে। এভাবে চ্যারিটি থেকে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানসসম্মত সমাজকর্মের গোড়াপত্তন হয়।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ডরোথী মসেস শ্রীলঙ্কায় ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল ওয়ার্ক প্রথম প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে এর সূচনা করেন। 'শ্রীলঙ্কা স্কুল অব সোস্যাল ওয়ার্ক ' নামে এ প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৪ সালে সুনামি বিপর্যয়ের পূর্ব পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই সমাজকর্ম শিক্ষার প্রতি তেমন মনোযোগী ছিল না। বিপর্যয় পরবর্তী সময়ে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞানে সমাজকর্ম বিষয়টিকে অন্তর্ভূক্ত করে। বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় National Institute of Social Development (NISD) সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ৬০ বছরের অধিক সময় ধরে 'Srilanka School of Social Work ' সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় ১৯৮১ সালে Yonsei University তে প্রথম সমাজকর্ম শিক্ষায় Under Graduate কোর্স প্রবর্তন করা হয়। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে Hallum University তে ১৯৮৪ সালে Social Welfare School প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে MSW কোর্স চালু রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজকর্মীরা লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে সমাজের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে এবং এ সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জাপানে আধুনিক সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত হয় ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯২২ সালে জাপানে স্বাস্থ্যবিমা প্রবর্তন করা হয়, যা সমাজকর্ম শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৯২৯ সালে সারাবিশ্বে অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দিলে সমাজকল্যাণ কর্মকাণ্ডে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন করে তোলে। এ

অবস্থা হতে উত্তরণে জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। 'Tokyo University of Social Welfare' বর্তমানে জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষায় প্রথম স্থানে রয়েছে।

পেশাদার সামাজিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চীনে 'Yenching University' তে ১৯২২ সালে সর্বপ্রথম সমাজবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। ১৯২৫ সালে এ বিভাগের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'Department of Sociology and Social Work'। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৮০ এর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুগুলোতে 'Civil Affairs Division' এর মাধ্যমে সরকার নিজেই বিভিন্ন সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। ১৯৯৯ সালের দিকে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ৩০টি সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয়। এর মধ্যে ৯টি সমাজকর্ম বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে। ২০০৬ সালে দুই শতেরও অধিক ইনস্টিটিউট সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিল। একই সালে সরকার অ্যাক্রিডিটেশন সিস্টেম চালু করে। ২০০৯ সালে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিভাগ চালু করা হয় এবং ২০১১ সালে ২৫৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিভাগ খোলা হয়। ২০১২ সালের দিকে ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান শুরু হয়। সার্বিকভাবে বলা যায়, চীনে সমাজকর্ম শিক্ষা দ্রুত বিকাশ লাভ করছে।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জনের পর বহু উদ্বাস্তু বাংলাদেশে আগমন করে। তাদের আগমনের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক নানা জটিল সমস্যা দেখা দেয়। তারা বস্তিসহ বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা মোকাবেলা করা পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এরই ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘের নিকট ১৯৫১ সালে পরামর্শ ও সাহায্যের আবেদন জানায়। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালে ৩ মাস মেয়াদি একটি স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। বর্তমান বাংলা একাডেমিতে ১৯৫৫-৫৬ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম ও শহর সমষ্টি উন্নয়নকর্মীদের জন্য ৯ মাস মেয়াদি আরও একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে সমাজকর্মের প্রতিষ্ঠানিক উচ্চতর শিক্ষার সূচনা করা হয়।

১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে 'সমাজকর্ম কলেজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক (পাস) এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সমাজকর্মকে অন্তভূক্ত করা হয়। কলেজটিতে ১৯৬৭ সাল থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রবর্তন করা হয়। রাজশাহীর সমাজকর্ম কলেজটিকে ১৯৭২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করা হয়। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ হিসেবে এটি ৪ বছর মেয়াদি অনার্স, ১ বছর মেয়াদি মাস্টার্স এবং এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করছে।

১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এ ইনস্টিটিউট থেকে ৪ বছর মেয়াদি অনার্স ও ১ বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিও এখান থেকে প্রদান করা হয়। সম্প্রতি এতে নৈশ শাখা খোলা

হয়েছে এবং নৈশ শাখায় সমাজকল্যাণ বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স শুরু হয়েছে।

১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানে সমাজকর্ম বিষয়ে পাঠদান করানো হচ্ছে।বর্তমানে এখানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রয়েছে।

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে সমাজকর্ম বিএসএস (সম্মান) ও এমএসএস কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের প্রায় সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পাস কোর্স পর্যায়ে সমাজকর্ম বিষয় পড়ানো হচ্ছে। উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে এমএসএস পাসের পর এমফিল ও পিএইচডি কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠকর্ম অনুশীলনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই মাঠকর্ম অনুশীলনকে সমাজকর্মের অন্যতম একটি পাঠ্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সমাজ বিকাশের ধারা : প্রেক্ষিত কার্ল মার্ক্সের ধারণা

প্রদীপ অধিকারী
প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী কার্ল হেনরিক মার্ক্স ১৮১৮ সালের ৫ মে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মানব ইতিহাসে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একজন। তাঁর মতে, পৃথিবীর ইতিহাস হল শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণি সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মানব সমাজগুলো বিকশিত হচ্ছে। মার্ক্স ব্যক্তিকে সমাজের ক্রমোন্নতির উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিরা একে অন্যের এবং সমাজের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

মার্ক্সের মতে, ইতিহাস অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। উৎপাদন পদ্ধতি মানব সমাজের বিকাশের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁর মতে, নিম্নে আলোচিত পাঁচটি ধারাবাহিক অবস্থার মধ্যদিয়ে মানব সমাজের বিকাশ ঘটে।

আদিম সাম্যবাদ : সমাজ বিকাশের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে নিম্নস্তর হল আদিম সাম্যবাদ। এ সময় মানুষ পাথর দ্বারা প্রথম অস্ত্র তৈরি করে, যা ছিল অমসৃণ ও স্থূল। সময়ের অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন আকারের ধারালো অস্ত্রের উদ্ভব হয়। এ সময় মানুষ আগুন জ্বালানো শেখে, যা মানবতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অস্ত্রের উন্নতির সাথে সাথে মানুষও কাজের উন্নতি করল। কৃষিকাজ, বৃক্ষরোপণ এবং পশুপালন শিখল। আদিম সাম্যবাদে উৎপাদন শক্তি অত্যন্ত নীচুস্তরে ছিল এবং উৎপাদন সম্পর্কও অনুরূপ নির্ধারিত ছিল, যার ভিত্তি মোট উৎপাদনের সাধারণ মালিকানা। প্রকৃতির বৈরি শক্তির সাথে মানুষ দলবদ্ধভাবে লড়াই করত। সগোত্রীয় লোক দলে বা গোষ্ঠীতে বাস করত। জীবিকা নির্বাহের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তাই উৎপাদন করত এবং সমানভাবে ভাগ করে নিত। কোনো ব্যক্তি মালিকানা, শ্রেণি বা শোষণ ছিল না। এরপর ধীরে ধীরে উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি হতে লাগল। পাথরের অস্ত্র ধাতব অস্ত্রে রূপান্তরিত হল। উৎপাদনের বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা সাধিত হল। মানুষ লাঙ্গলের ব্যবহার শিখল এবং শস্য উৎপাদন শুরু করল। উৎপাদকরা প্রয়োজনের অধিক দ্রব্য উৎপাদন শুরু করল। ফলে মজুত বৃদ্ধি পেল এবং প্রথম সমাজে শ্রমের বিভাজন দেখা দিল। তারপর ব্যবসা উৎপাদনের স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে পরিগণিত হল।

উৎপাদন-শ্রম-দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে দল বা গোষ্ঠী ভেঙ্গে পরিবারে পরিণত হল। ব্যক্তি মালিকানার উদ্ভব হল। গড় উৎপাদনের মালিক হল পরিবারগুলো, যারা পূর্বে উচ্চপদের গোষ্ঠী ছিল এবং তারা অন্যদের

শোষণ করতে লাগল ও ধনী হতে শুরু করল। ব্যক্তি সম্পত্তি ও পণ্যের বিনিময় বৃদ্ধি পেল। সামাজিক অসাম্যবস্থায় আদিম সাম্যবাদ বিলুপ্ত হল। ফলে বিরোধী শ্রেণি, দাস ও দাস মালিকের উদ্ভব হল।

দাসযুগ : কাঠ ও পাথরের অস্ত্রের পরিবর্তে তাম্র ও লোহার অস্ত্রের উদ্ভব হল। ছোট ছোট কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হল ও বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদন শুরু হল। ফলে শ্রমের বিভাজন চলতে লাগল। ব্যবসায় বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হল এবং শহর গড়ে উঠল। উৎপাদন শক্তির উন্নতি তরাণ্বিত হল উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা। দাস মালিকেরা গড় উৎপাদনসহ সব কিছুর মালিক হল এবং দাসদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সৈন্য, বিচারালয়, সরকার প্রভৃতির সৃষ্টি করল। দাসশ্রেণি যারা ছিল উৎপাদন শক্তির উৎস তারা অল্পসংখ্যক মালিক বা প্রভূর দ্বারা অত্যাচারিত ও নিষ্ঠুরভাবে শোষিত হোত এবং কোনো স্বাধীনতা ছিলো না। উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হল দাস সমাজে। এই দ্বন্দ্ব দাস বিদ্রোহের সূচনা করল।

নিষ্ঠুরভাবে শোষিত দাসেরা মরিয়া হয়ে মালিকের বিরূদ্ধে জেগে উঠল। ফলে দাস যুগ শেষ হল এবং সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হল।

সামন্ত যুগ : এই যুগে মানুষ জলশক্তি ও বায়ুশক্তির ব্যবহার শিখল এবং পালতোলা জাহাজ তৈরি করল। নতুন নতুন যন্ত্র ও মিল-কারখানার সৃষ্টি হল। সামন্ত উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা উৎপাদন শক্তির আরও বৃদ্ধি হল। সামন্ত প্রভূরা ভূমি ও ভূমি দাসদের মালিক হল। যদিও অল্প সংখ্যক কৃষক ও কারিগরদের কিছু কিছু নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। সামন্ত প্রভূরা ভূমিদাসদের ক্রয়-বিক্রয়, শোষণ ও অত্যাচার করত। সামন্ত যুগে রাষ্ট্র এবং সশস্ত্র বাহিনীর উদ্ভব হল। সমাজের এবং মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে ধর্ম স্থান লাভ করল। ভৌগলিক পথ আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার গড়ে উঠল। বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কল-কারখানায় শ্রমিকের চাহিদা বাড়ল এবং বড় ধরনের শ্রমের বিভাজন শুরু হল। অপরদিকে সামন্তপ্রভূরা ভূমিদাসদের ভূমির কাজে বেঁধে রাখল। ফলে উৎপাদন শক্তির সাথে সামন্ত উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দ্বন্দ্বের ফলে পুঁজিপতি উৎপাদন শুরু হয়। ফলাফল হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও নিম্ন বা মজুর শ্রেণির উদ্ভব হয়। পুঁজিপতি উৎপাদন সম্পর্ক সামন্ত উৎপাদন সম্পর্কের স্থান দখল করল। এটা সম্ভব হল ভূমিদাস ও শহরের নিম্নশ্রেণির লোকদের দ্বারা যার নেতৃত্বে ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

পুঁজিবাদ : বড় বড় কোম্পানীগুলো হস্তশিল্প ও ছোট ছোট কল কারখানার স্থান দখল করল। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা উৎপাদন শক্তির অধিক উন্নতি সহজতর হল। পুঁজিবাদ নির্দেশ করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শোষণের নিত্যতা ও অপরিবর্তনশীলতা। ফলে মজুর শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি পুঁজিবাদের বিরূদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হল। উৎপাদন শক্তির অতিদানবিক বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের পুঁজিবাদ সম্পর্ক ভেঙ্গে গেল। সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত উৎপাদনের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হল।

শ্রমিকেরা উৎপাদন করতো আর স্বল্পসংখ্যক পুঁজিপতিরা তা উপভোগ করত।

পুঁজিবাদের শেষ ও চরমরূপ হলো সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদে পুঁজির বৃদ্ধির জন্য একচেটিয়া অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিদের অত্যাচার শুরু হল। সাম্রাজ্যবাদীরা মজুরশ্রেণি ও তাদের উপর নির্ভর দেশগুলির উপর তীব্রভাবে শোষণ শুরু করল।

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সকল দ্বন্দ্ব আরও বাড়িয়ে দিল, বিশেষ করে সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তি উৎপাদনের মধ্যে। ফলে প্রচণ্ডভাবে শ্রেণি সংগ্রাম দেখা দিল। ফলশ্রুতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রযাত্রা শুরু হল।

সমাজতন্ত্র : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হওয়ার ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বিলুপ্ত হয় এবং নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এই সমাজে কোনো শোষণকারী থাকবে না। সাম্যই হবে সব। রাষ্ট্র থাকবে সাম্যতা রক্ষার্থে।

ব্যক্তি সম্পদের সাম্যতা আনবে রাষ্ট্রজীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির সম-মঙ্গল।

কার্ল মার্ক্স তাঁর ধারণা দিয়ে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজ ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শ্রমিকশ্রেণির উত্থানের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তিনি। তাঁর ধারণা বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং আজও মার্ক্স তাঁর মতবাদ দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন।

স্মৃতিতে অম্লান, মোংলা সরকারি কলেজ

প্রফেসর রবীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মোংলা সরকারি কলেজ

যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যাগাজিন প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটে থাকে। মেধাবীরাই তাদের সৃজনশীল কার্যধারাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে ম্যাগাজিনের প্রতিটি পাতায়। অনেকেই তাদের জীবনের প্রথম লেখাটি এখানে লিখবে, আর এটাই হবে তাদের প্রথম সৃষ্টি।

শিক্ষা মানুষের হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করে, মানুষের মনকে আকাশের মত উদার করে, হীন প্রকৃতি পরিহার করার মাধ্যমে মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। একজন শিক্ষার্থীর জীবন হলো আরশির (আয়না) ন্যায়, যার দ্বারা নিজ প্রতিষ্ঠানের ছবি অবলোকন করা যায়। শিক্ষার্থীরা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। সিলেবাসের পাশাপাশি নিজেদের মেধার বিকাশের জন্য উত্তম উপায় হল এই ম্যাগাজিন। নিজ উদ্যোগে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোজগতে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাগুলোর প্রকাশ করতে পারলেই তারা হয়ে উঠবে আগামী দিনের কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও সাংবাদিক।

দিনের পর দিন কত চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজ মোংলা সরকারি কলেজ শহরের উচ্চ শিক্ষায় দাঁড়িয়ে বীরদর্পে সুদৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসরগামী। শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত জীবন, পারিপার্শ্বিক জীবন ও সামাজিক জীবনের অগ্রগতির মাধ্যমে দেশের বর্তমান শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর কে এম রব্বানীর নেতৃত্বে যুগোপযোগী বিশ্ব নাগরিক গঠনের ভিত্তি রচনা করে চলেছে।

বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার অধীন মোংলা উপজেলায় অবস্থিত মোংলা সরকারি কলেজ ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০১৬ সালে সরকারি কলেজ হিসেবে যাত্রা শুরু করে। সরকারিকরণের পর ২০২৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি আমি প্রথম ১৪তম বিসিএস ক্যাডার থেকে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করি। অল্পদিনের মধ্যেই কলেজের শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও ভালবাসা এবং চারপাশের ছায়া ঘেরা সবুজ মনোরম পরিবেশে আমি নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে চাই প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব সুনীল কুমার বিশ্বাস, ইউএনও জনাব দীপঙ্কর দাস, এ সি ল্যান্ড জনাব হাবিবুর রহমান সহ কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান

শিক্ষকবৃন্দ, প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় সমাজ সেবক, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, মোংলার নাগরিক সমাজ, মোংলা ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর সহ যারা সার্বিকভাবে আমার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এছাড়াও যারা সার্বক্ষণিক আমার পাশে ছিলেন, তাদের মধ্যে কলেজের শিক্ষক কুবের চন্দ্র মণ্ডল, শেখ আনোয়ার হোসেন, মল্লিক অহিদুজ্জামান, ড. অসিত কুমার বসু, শ্যামা প্রসাদ সেন, ড. অপর্ণা অধিকারী, প্রদীপ অধিকারী, আ. ই. শ. ম বাকী বিল্লাহ, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, মনোজ কান্তি বিশ্বাস, এস. এম. মাহবুবুর রহমান, দেবদাস বাড়ই, পলাশ চক্রবর্তী, মোঃ কামাল উদ্দিন, নন্দ কিশোর পাল, কলেজের তৎকালীন সম্পাদক সাহারা বেগম, প্রমীলা রায়, মমতাজ খানম, নিলুফা খাতুন, পাপিয়া হালদার, রূপা দাস, বীনা বিশ্বাস, নিগার সুলতানা সুমি, নাজমুল হক, খাদিজা খাতুন, ইব্রাহিম খলিল, নাদিম মোহাম্মদ ফয়সাল, সাইদুজ্জামান মিন্টু, শেফালী মণ্ডলসহ সকল সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কর্মচারীদের প্রতিও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, আগামী দিনগুলো সকলের জন্য বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। সকলের জীবন আরও সুন্দর হোক ও সফলতায় ভরে উঠুক আগত দিনের প্রতিটি মুহূর্ত। সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবার প্রতি সহায় থাকুন এই আমার প্রার্থনা।

আমাদের অদম্য মেধাবীরা

এস. এম. মাহবুবুর রহমান
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই তাকে বিশাল প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হয়েই তার এই পৃথিবীতে আগমন ঘটে। জাইগোট ফরমেশনে কোটি কোটি শুক্রাণুর মধ্য থেকে মাত্র একটি বা দুটি সর্বশেষ পর্যায়ে সফলভাবে পৌঁছাতে পেরেই মানব ভ্রুণে রূপান্তরিত হয় এবং দীর্ঘ পরিক্রমা শেষে এই সুন্দর পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। কিন্তু পরিবার, সমাজ,রাষ্ট্র সর্বত্রই তাকে কঠিন যুদ্ধ মোকাবিলা করেই জীবনের সফলতা অর্জন করতে হয়। সবাই তো আর সফল হয় না সকলেই সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায় না। অর্থাভাবে, পারিবারিক অসচ্ছলতার কষাঘাতে জরজরিত মানুষটি তার শ্রেষ্ঠ হওয়ার সফলতার জন্মগত কাহিনীই ভুলে যায়।আর দিনে দিনে সে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের বোঝা হিসেবে নিজেকে ভাবতে থাকে। আর এভাবেই সফলতা-অসফলতার গল্প রচিত হয়। সফল তো সে-ই হয় যে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নিজের ইচ্ছা শক্তি ও কঠোর পরিশ্রমে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় এবং ফল হিসেবে সফলতার মুখ দেখে। পারিবারিক অসচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও অদম্য ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সফলতার নজির সৃষ্টি করেছে মোংলা সরকারি কলেজের এমন কিছু অদম্য মেধাবীদের বিজয়গাঁথা তুলে ধরছি।

সুমিত চন্দ: বাবা জীবিত থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াই ভাড়া বাসায় থেকে একমাত্র গৃহিণী মায়ের অক্লান্ত শ্রমের ঘামে অর্জিত টাকায় এবং নিজের প্রাইভেট পড়ানো টাকায় চার ভাই-বোনের সাথে বেড়ে ওঠা পিতৃস্নেহ বঞ্চিত সুমিত চন্দ সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস এস সি এবং মোংলা সরকারি কলেজ থেকে গোল্ডেন জিপিএ ৫.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।অতঃপর খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলসহ গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। সুমিত চন্দের নেতৃত্বে একটি চৌকস ইঞ্জিনিয়ার দল বিশ্ববিখ্যাত মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র আমেরিকার 'নাসা' আয়োজিত অ্যাপস প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় 'মহাকাশ টিম'। বিশ্বের সেরা সেরা রাষ্ট্রের প্রতিযোগীদের হারিয়ে বিশ্ব সেরা দল হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে বাংলাদেশকে পৃথিবীর ইতিহাসে মহিমান্বিত করে মর্যাদা বাড়িয়েছে। সুমিত চন্দ বর্তমানে আমেরিকার The University of Texas at EI Paso তে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে মাস্টার্স শেষ করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য পড়শুনা করছে। আমেরিকা যাওয়ার পূর্বে বাংলাদেশে একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিল।

ছবি : বিশ্ব সেরা ‘নাসা স্পেস অ্যাপস প্রতিযোগিতা’ মহাকাশ টিমের দলনেতা সুমিত চন্দ ও তার দলের সদস্যরা

প্রফেসর ড. উজ্জ্বল বিশ্বাস: পরিশ্রম সফলতার চাবিকাঠি। স্বপ্নবান মানুষই পারে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে। “For if dreams die; Life is a broken-winged bird; That cannot fly.” (“যদি স্বপ্ন মরে যায়; জীবন হয় এক ডানাহীন পাখীর মতো, যে উড়তে পারেনা”)। স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতেই হয়। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের স্বপ্ন পূরণে সফলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল বিশ্বাস নিজেই। পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতা তার জন্য বাঁধা হতে পারেনি। মোংলার হলদিবুনিয়া গ্রামের পাশে দাসেরখণ্ড গ্রামের এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান উজ্জ্বল বিশ্বাস। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনার প্রতি ভীষণ মনোযোগী উজ্জ্বল বিশ্বাসের একমাত্র অনুপ্রেরণা ছিল তারই জ্যাঠামশাই হলদিবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত বিজ্ঞানের শিক্ষক বাবু হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং কঠোর পরিশ্রমের কারনে উজ্জ্বল বিশ্বাস হলদিবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং মোংলা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের Electronics and Communication Engineering Discipline এ ভর্তি হন।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই তিনি তার সফলতার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেন এবং চার বছর শেষে, ২০১১ সালে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের Science Engineering and Technology স্কুলের আটটি ডিসিপ্লিনের মধ্যে সর্বোচ্চ সিজিপিএ সহ ডিস্টিংশন নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে তার ব্যাচেলর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এ তার এই কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ২০১৫ সালে তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের Science Engineering and Technology স্কুল থেকে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

তার এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের Electronics and Communication Engineering Discipline এ প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে ২০১৪ সালে ডিস্টিংশন সহ তার মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর তিনি তার পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়া সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের Prestigious Endeavor Post-graduate Scholarship (PhD Category) প্রাপ্ত হন এবং বিশ্ব র‍্যাংকিং এ অস্ট্রেলিয়া সিডনি'র নামকরা The University of New South Wales (UNSW) এ তার পড়াশোনা শুরু করেন। ২০২১ সালে তিনি The University of New South Wales (UNSW) থেকে PhD in Biomedical Engineering (ডক্টরেট) ডিগ্রি অর্জন করেন।

অদম্য মেধাবী উজ্জ্বল বিশ্বাস বর্তমানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে Electronics and Communication Engineering Discipline এ প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন।

ইমরান হোসেন ফয়সাল : মোংলা শহরের এক সাধারণ ব্যবসায়ীর সন্তান ইমরান হোসেন ফয়সাল। স্কুল জীবন থেকেই ছিল মেধাবী। সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি সম্পন্ন করেন। আর্থিক অসচ্ছলতা লক্ষ্য অর্জনে স্থির থাকা ব্যক্তির জন্য বাঁধা হতে পারে না তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইমরান হোসেন ফয়সাল। পড়শুনার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ফয়সালকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার জন্য তার গর্বিত পিতা মাতা ব্যাংক থেকে শিক্ষা লোন নিয়ে সন্তানের ইচ্ছা পূরণ করেন। এই অদম্য মেধাবী মোংলা সরকারি কলেজ থেকে ২০০৫ সালে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলসহ উত্তীর্ণ হয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে Architecture Discipline এ ভর্তি হন এবং কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলসহ প্রথম শ্রেনীতে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ২০১৪ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে Architecture Discipline এ প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর NFP Scholarship নিয়ে Erasmus University, Netherlands এ Urban Management and Development এর উপর পোস্ট গ্রাজুয়েশন (MSc) সম্পন্ন করেন Ges Best Thesis Award প্রাপ্ত হন। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিটেকচার ডিসিপ্লিন এ সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

অলোক পাল : বাবা খুব স্বল্প বেতনে বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতা করেন। পারিবারিক আর্থিক অবস্থা তখন ভাল নয় কিন্তু অলোক পাল তার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে মোংলা কলেজ থেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল নিয়ে জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি বিভাগে ভর্তি হয়। সেখান থেকে অত্যন্ত কৃতিত্ব পূর্ণ ফলাফলসহ গ্রাজুয়েশন ও পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। বাংলাদেশে থাকাকালীন দেশ সেরা ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানীতে কোয়ালিটি অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।বর্তমানে সে অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চপদে চাকুরী করে।তার স্ত্রী ও ফার্মেসি বিষয়ে পড়াশুনা সমাপ্ত করে অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চপদে কর্মরত। এই অদম্য মেধাবী অলোক পাল পরিবারসহ অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছে। অলোক পাল, মোংলা সরকারি কলেজের গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) অজিত পাল স্যারের বড় সন্তান। অজিত পাল স্যারের মেয়ে দীপা পাল ও

মোংলা সরকারি কলেজ (২০১৬ সালে জাতীয়করণ) থেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলসহ খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে মোংলা ইপিজেডে একজন উর্ধতন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছে।

ডা. সালমা আক্তার : অভাব অনটন বা আর্থিক অসচ্ছলতা কোন অদম্য মেধাবীর এগিয়ে যাওয়াকে আটকে রাখতে পারে না সে তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেই। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হলেন তার বাবা যিনি পরিবারের ভরণপোষণ ও সন্তানদের লেখা পড়া চলমান রাখার জন্য দিন-রাত রিক্সা চালান। এত স্বল্প আয়ে চলা আট ভাই-বোনের বিশাল বড় সংসারের বড় মেয়ে সালমা আক্তার। ইসলামী আদর্শ একাডেমি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ও মোংলা সরকারি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৫.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হয় অদম্য মেধাবী সালমা আক্তার।অতঃপর কঠিন ভর্তি যুদ্ধ জয় করে ভর্তি হয় বাংলাদেশের অন্যতম সেরা মেডিকেল কলেজ 'স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ড হাসপাতাল,' ঢাকা ডেন্টাল বিভাগে এবং সেখান থেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলসহ গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। ৪১ তম বিসিএস এ স্বাস্থ্য ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়।বর্তমানে ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বাগেরহাটে কর্মরত। যে স্বপ্ন ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে যা ছিল অকল্পনীয় সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে অদম্য মেধাবী সালমা আক্তার। স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিজের ইচ্ছাশক্তি ও পরিশ্রমের বাস্তবায়নই সালমা আক্তারের এই সফলতা। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া স্মরণে জয়িতা নির্বাচনে 'শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সফল নারী' ক্যাটাগরিতে মোংলা উপজেলার শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচিত হয়। স্বাভাবিক চাহিদা মেটানো যে পরিবারে থাকে স্বপ্ন সেরকম পরিবারে বেড়ে ওঠা অদম্য মেধাবী সালমা আক্তার এখন সফল ও স্বাবলম্বী নারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ডা. মৌসুমী আফরোজা মৌ : বাংলাদেশের অন্যতম সেরা মেডিকেল কলেজ 'স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা তে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হওয়ার ২১ দিনের মাথায় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার বাবা মৃত্যুবরণ করেন। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো, হতাশায় ভেংগে না পড়ে লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় হলো মৌ। উকিলের সহকারী বৃদ্ধ নানা ও মায়ের অপরিসীম কঠোরপরিশ্রমের আয়ে ও নিজে শিক্ষার্থী পড়িয়ে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে এমবিবিএস সম্পন্ন করে। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা লক্ষ্য অর্জনে কোন বাধা হতে পারে না। অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও লক্ষ্য অর্জনে স্থির থাকা কাউকে দমিয়ে রাখা যায় না তার উজ্জল দৃষ্টান্ত মৌসুমী আফরোজা মৌ। সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও মোংলা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত হয়ে ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা ভর্তি হয় এবং এই মেডিকেল কলেজ থেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলসহ এমবিবিএস সম্পন্ন করে। ৩৯তম বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসক হিসেবে যোগদান করে। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া স্মরণে জয়িতা নির্বাচনে 'শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সফল নারী' ক্যাটাগরিতে মোংলা উপজেলার শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচিত হয় এবং বাগেরহাট জেলারও শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচিত হয় মৌসুমী আফরোজা মৌ। বর্তমানে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য আমেরিকায় পড়াশুনা করছে। এই

অদম্য মেধাবী বর্তমানে নারীদের প্রেরণা ও সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ডা. কবিরুল ইসলাম : শ্রমিক পিতার চতুর্থ সন্তানের মধ্যে তৃতীয় সন্তান কবিরুল ইসলাম। পারিবারিক অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা তার লক্ষ্য অর্জনে বাঁধা হতে পারেনি। সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং মোংলা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং উভয় পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত হয়।অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র কবিরুল ইসলাম দেশের সেরা মেডিকেল কলেজ 'ঢাকা মেডিকেল কলেজে' ৫২ তম মেধাক্রমে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হয়ে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলসহ গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। ৩৯ তম বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে একজন সফল চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত আছে।

রব্বানী আক্তার : তিনভাই-বোনের লেখাপড়া একসংগে চালিয়ে যাওয়ার খরচ যে পরিবারের সম্ভব হয়নি সেই পরিবারে জন্ম নেয়া মেধাবী মেয়েটির নাম রব্বানী আক্তার।প্রচন্ড লেখা পড়ায় আগ্রহী মেয়ের স্বপ্ন পূরণের জন্য বাবা-মা সিদ্ধান্ত নেন যত কষ্টই হোক মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন বড়বোন নিজেকে পড়ালেখা থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বোনের প্রতি ভালবাসা দেখিয়ে ছোট বোনের লেখাপড়া চলমান রাখার সিদ্ধান্ত দেয় এবং সেভাবেই এগিয়ে চলে রব্বানীর লেখাপড়া। চাঁদপাই মেছের শাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি এবং মোংলা সরকারি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি সম্পন্ন করে। পূর্বে যে মেয়ের গ্রাম থেকে খুলনা শহরে যাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি, সেই মেয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হয় এবং কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে। ৪১ তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে জামালপুর জেলার মেলান্দহ সরকারি কলেজে অর্থনীতি বিষয়ের প্রভাষক পদে শিক্ষকতা করছে। রব্বানী আক্তার নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া স্মরণে জয়িতা নির্বাচনে 'শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সফল নারী' ক্যাটাগরিতে মোংলা উপজেলার শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচিত হয় এবং বাগেরহাট জেলার শ্রেষ্ঠ জয়িতা হওয়ার গৌরব অর্জন করে। অদম্য মেধাবী রব্বানী আক্তার সকলের কাছে অনুপ্রেরণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পার্থ সারথী মন্ডল : মোংলা উপজেলা সংলগ্ন মোরেলগঞ্জের ডেওয়াতলা গ্রাম থেকে আসা এক অতি সহজ সরল শারীরিক ভাবে অক্ষম বৃদ্ধ পিতৃ-মাতার সন্তান পার্থ সারথী মন্ডল। অত্যন্ত পড়ুয়া ও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে মোংলা সরকারি কলেজে ভর্তি হয়।অর্থনৈতিকভাবে খুবই অস্বচ্ছল। তখন তার কাকা বেসরকারি মাদ্রাসার শিক্ষক গিরিশ মণ্ডলের ভাড়া বাসায় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা করতো। নিয়মিত ক্লাস করেই এইচএসসি তে গোল্ডেন জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (MEC) থেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলসহ গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। ৩৮তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) চুড়ান্তভাবে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে সে ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছে। পার্থ সারথী মণ্ডল একজন সফল ও প্রতিষ্ঠিত অদম্য মেধাবী।

পপি হাজরা : অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালীন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম শ্রমিক পিতা আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। হত দরিদ্র অসহায় দুই বোনের লেখাপড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তখন নিজেই ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে নিজের লেখা পড়ার খরচ চালিয়ে যায়। সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও মোংলা সরকারি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি সম্পন্ন করে। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বোনের লেখা পড়ার সুযোগ হওয়ায় তাদের লেখাপড়ার খরচ চালানো আরো অসম্ভব হয়ে ওঠে ঠিক সে সময় কতিপয় শুভাকাঙ্ক্ষীর সহযোগিতা ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতা এবং নিজেরা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়িয়ে সেই আয়ের মাধ্যমে তাদের লেখাপড়া সম্পন্ন হয়। পপি হাজরা প্রাণিসম্পদ ডাক্তার হিসেবে লেখাপড়া সম্পন্ন করে। বর্তমানে সে একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছে। তার বোন পাপড়ি হাজরা সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছে। পপি হাজরার মতো অদম্য মেধাবীরা এখন স্বাবলম্বী ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত সফল মানুষের অনুপ্রেরণা।

রাকিবুল ইসলাম রিহাব : করোনা কালীন পিতার ব্যবসায় ধ্বস নামে এবং তার পরিবার অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছলতার সম্মুখীন হয় ।আর্থিক অসচ্ছলতাকে জয় করে অত্যন্ত মেধাবী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রাকিবুল ইসলাম রিহাব সেন্ট পলস উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং মোংলা সরকারি কলেজ থেকে (যশোর বোর্ডে এসএসসি তে ১৪তম ও এইচএসসিতে ২৩তম মেধাক্রম এবং ট্যালেন্টপুলে বোর্ড বৃত্তি প্রাপ্ত) গোল্ডেন জিপিএ ৫.০০ পেয়ে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা মেডিকেল কলেজ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকায় এমবিবিএস কোর্সে চতুর্থ বর্ষে পড়াশুনা করছে।

সায়মন বয়াতী : অতিমাত্রায় মাতৃভক্ত সায়মন বয়াতীর মাতা এইচএসসি পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিন আগে মৃত্যুবরণ করেন। এমন মানসিক অবস্থায় ভেঙ্গে না পড়ে নিজের লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সায়মন বয়াতী। হতদরিদ্র অত্যন্ত মেধাবী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সায়মন বয়াতী শত প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থাকা সত্বেও ক্লাসে কখনোই অনুপস্থিত না থাকা নিয়মিত ক্লাসকরা শিক্ষার্থী সায়মন বয়াতী সবেদ খান মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং মোংলা সরকারি কলেজ থেকে উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি' ইউনিটে ৫ম মেধাক্রম নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ইংরেজি সাহিত্যে বর্তমানে ২য় বর্ষে পড়াশুনা করছে।

পূজা দাম : মা ইপিজেডের একজন স্বল্প বেতনের শ্রমিক, বাবা বৃদ্ধ এবং তিনি খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় একটি গ্রামের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বল্প বেতনে নৈশ প্রহরী হিসেবে চাকুরী করেন। অর্থনৈতিকভাবে খুবই অসচ্ছল। এমন পরিবারে জন্ম নেয়া মেধাবী শিক্ষার্থী পূজা দাম তার অদম্য ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তার লক্ষ্য অর্জনে সফল। সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং মোংলা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি। উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত। অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক মেডিকেল কলেজ পরীক্ষায় পড়ার সুযোগ পেয়ে নিজস্ব মেধার স্বাক্ষর রেখেছে। বর্তমানে পূজা দাম যশোর মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশুনা করছে।

উত্তম বিশ্বাস : বাবা রাজমিস্ত্রীর সহযোগী। বসতবাড়ি নদী ভাংগনে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে স্থানান্তরিত জায়গায় বসবাস। মোংলার চাঁদপাই ইউনিয়নের কানাইনগর গ্রামের পশুর নদীর পাড়ের বাড়িতে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা সন্তানের নাম উত্তম বিশ্বাস। খেয়ে পরে বেঁচে থাকা যেখানে দুষ্কর সেই পরিবারে জন্ম নেয়া ছেলেটি উত্তম বিশ্বাস এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সাইন্স বিষয়ে স্নাতক। অত্যন্ত মেধাবী উত্তম বিশ্বাস সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও মোংলা সরকারি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচ এস সি পাশ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সাইন্স বিষয়ে ভর্তি হয় এবং কৃতিত্বের সাথে কম্পিউটার সাইন্সে স্নাতক সম্পন্ন করে নিজেকে অদম্য মেধাবী হিসেবে প্রমাণ রেখেছে।

কামাল উদ্দিন মনির ও রাবেয়া খাতুন মুনিয়া : পিতা মোঃ শাহজাহান মোংলা বন্দরের একজন শ্রমিক ছিলেন।বর্তমানে বয়ঃবৃদ্ধ। শেলাবুনিয়ার ভাড়া বাসায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা সাত সন্তানের প্রত্যেকেই খুবই মেধাবী। পারিবারিক অসচ্ছলতা এই অদম্য মেধাবী সন্তানদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে বাঁধা হতে পারেনি। কামাল উদ্দিন মনির জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল সহ গণিত বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমাপ্ত শেষে বরিশাল ক্যাডেট কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করে।বর্তমানে জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত।তার বড়ভাই জালাল উদ্দিন মাসুম ভোলার একটি বেসরকারি কলেজে গণিতের প্রভাষক। বোন রাবেয়া খাতুন মুনিয়াও জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল সহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করে উচ্চ শিক্ষার জন্য Mississippi State University, America তে পড়াশুনা করছে। এরা সকলেই সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং মোংলা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি। উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত।

অনন্যা ইয়াসমিন ও ইমরান হোসেন : পিতা বাবুল হোসেন মোংলা বাজারের একজন ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী।কাইনমারী গ্রামের হত দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা অনন্যা ইয়াসমিন কঠিন ভর্তি যুদ্ধ জয় করে মিডফোর্ড মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল সার্জন বিভাগে ভর্তি হয়। বর্তমানে ইন্টার্ণশিপ করছে এবং তার ছোট ভাই ইমরান হোসেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩য় বর্ষে পড়াশুনারত। উভয়েই মোংলা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি তে জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত। পারিবারিক অসচ্ছলতা এই অদম্য মেধাবী ভাই-বোনের জন্য বাঁধা হতে পারেনি। এদের বড়বোন রুমা আক্তার মোংলা সরকারি কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি সম্পন্ন করেছে।

মোংলা সরকারি কলেজ থেকে পড়াশুনা করে অসংখ্য শিক্ষার্থী বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় উচ্চপদে থেকে দায়িত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করছেন। সেই সমস্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ (জানা তথ্যের ভিত্তিতে) ব্যক্তি ও কর্মজীবনে সফল তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক নাম উল্লেখ করছি তারা হলেন: এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, এজিএম ও কর্পোরেট শাখা প্রধান, বাংলাদেশ রূপালী ব্যাংক, গোপালগঞ্জ, মো: মোজাম্মেল হক চৌধুরী,উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, নাজমা আক্তার, সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি বি এল কলেজ, খুলনা, সাইফুল ইসলাম সোহাগ, যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা, চয়ন কুমার

তরফদার, যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা, মিঠুন সরকার, কৃষি অফিসার, আদনান (BUET থেকে কম্পিউটার সাইন্সে স্নাতক) লন্ডনের বিখ্যাত এক কোম্পানীতে প্রোগ্রামার হিসেবে কর্মরত, মো: মনিরুল হক চৌধুরী, প্রিন্সিপাল অফিসার, জনতা ব্যাংক, ফাহাদ ইসলাম বর্ণ, (BUET থেকে স্নাতক), Lecturer,Dept. of Civil Engineering, Presidency University,Bangladesh, অরুণ বৈরাগী, প্রভাষক, খুলনা পাবলিক কলেজ, সুব্রত বিশ্বাস, সমাজসেবা অফিসার, ডুমুরিয়া, পুস্পজিৎ মজুমদার ও সাজু বিশ্বাস, প্রিন্সিপাল অফিসার, সোনালী ব্যাংক, শতদল মজুমদার, ওসি(তদন্ত), বানারীপাড়া, সুব্রত বিশ্বাস (BUET থেকে স্নাতক), উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার, এলজিইডি, আব্দুল হাকিম, কম্পিউটার প্রোগ্রামার, HT Solution , টক, মো: কামরুল ইসলাম, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার (কুয়েট), মবক, ফরহাদ হোসেন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (KUET), মবক, মো: আল-আমীন, প্রিন্সিপাল অফিসার ও ম্যানেজার,জনতা ব্যাংক, গাজী মুক্তাদির রহমান Mechanical Engineer, (KUET), Dy Manager, Shah Cement, রিফাত হাসান হালিম (RUET), প্লান্ট ম্যানেজার, দুবাই বাংলা এলপি গাস লিঃ, আসিফুর রহমান আকাশ (BUET থেকে স্নাতক), ইমামুল কবির হিমেল (RUET থেকে স্নাতক), ঐক্য বিশ্বাস (KUET থেকে কম্পিউটার সাইন্সে স্নাতক), জ্যোতিষ বিশ্বাস (গোপালগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সাইন্সে স্নাতক), মোজাম্মেল হোসেন সজল, Software Engineer, ডা. ইয়াসিন আরাফাত (MBBS), ডা. মো: রাসেল, (MBBS)। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় থেকে বিভিন্ন পদে এবং বাংলাদেশ সেনা বাহিনী ও বিমান বাহিনীতে অনেকেই উচ্চপদে আসীন আছেন।

ছাত্র-ছাত্রীর কৃতিত্বে আমরা গর্বিত হই, আনন্দিত হই আর সে যদি হয় অদম্য মেধাবী তাহলে আনন্দের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়। মোংলা সরকারি কলেজে পড়াশুনা করে যারা সফলতা অর্জন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের পরিবার, কলেজ, নিজের জন্মভূমিকে তথা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে তাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা রইলো। মোংলা সরকারি কলেজে আরও অনেক অদম্য মেধাবীরা আছে যাদের সম্পর্কে তথ্যাভাবে লেখা সম্ভব হয়নি তাদের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা ও তাদের সম্পর্কে লিখতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি আমার প্রতিষ্ঠান নিয়ে গর্বিত। আগামী দিনে আমাদের কলেজে পড়াশুনারত ও ভবিষ্যতের শিক্ষার্থীরা আরও মহৎ কর্মের মাধ্যমে কলেজকে মহিমান্বিত করবে এবং সমগ্র দেশের গর্বিত সন্তান হবে-এটাই প্রত্যাশা করি।

তথ্য সূত্র : ব্যক্তিগত পরিচয়, আলাপচারিতা।

মায়া

মোসাঃ খাদিজা খাতুন
প্রভাষক, ইসলামি শিক্ষা, (বিসিএস : ৪০তম আবর্তন), মোংলা সরকারি কলেজ

আমার ভ্যানগাড়িটা ধূসর রঙের বাড়িটার সামনে দাঁড়াতেই বুকটা ধক্ করে উঠলো। নানান স্মৃতি মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। কেন জানি রোকেয়া হলের মাঠটার কথা মনে পড়ছে। ফেলে আসা বইয়ের টেবিল, ঢাকার ব্যস্ত জীবন। এসব ভাবতেই মনে পড়লো নীলক্ষেতে সিল বানাতে দেওয়া হয়েছিল, আনতে মনে নেই। এই স্মৃতি গুলো নিয়েই আগামী কয়েকটা বছর এই নতুন জায়গায় থাকতে হবে। এই নতুন জায়গায় নতুন নতুন স্মৃতি তৈরি হবে। বাড়িটার দিকে তাকালে মনে হয় বেশ পুরানো বাড়ি। বোধহয় দেয়ালে লবণ জমে আরো বেশি পুরানো দেখাচ্ছে। সমুদ্রের কাছে বেড়ে ওঠা এই শহরের বাড়িগুলোতে এই লবণাক্ততা দেখা যায়। বাড়ির ভেতরটায় ঢুকতে হলো মস্ত এক কুকুরের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে। দক্ষিণের জানালা খুলেই চোখ পড়লো মস্ত বড় পুকুরটার দিকে। পুকুরটার চারপাশে সারি সারি নারিকেল, শুপারী গাছ। এতো বেশি গাছ যে মনে হয় সবুজের মাঝ খানে এক খণ্ড পুকুর। মোংলার এই বিষয়টা ভালো লেগে গেলো। চারিদিকে সবুজের শাসন। ঢাকায় যেটা নাই বললেই চলে। নারিকেল, সুপারি ছাড়াও যে গাছগুলো দেখলাম সবই চেনা। আমের শাখাগুলো দেখে অবাক হলাম। আম বেশ বড় হয়ে গেছে। আমি আমের দেশের মানুষ। আমাদের অঞ্চলে এখনো আমের গুটি হয়েছে মাত্র, আর এখানে আম বেশ বড় হয়ে গেছে। শৈশবে আমের সাথে কত স্মৃতি, এগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আচ্ছা আজকালকার ছেলে-মেয়েরা কি আম আটির ভেঁপু বানাতে জানে? হয়তো জানে না।

না জানাটাই স্বাভাবিক। অনেকগুলো গাছের মধ্যে, সফেদা গাছটাই আমার অদেখা ছিল। গাছটা পুকুরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

মেটে রঙের সফেদায় গাছটা ভরে গেছে। এই ফলটার আদি নিবাস মেক্সিকো আর মধ্য আমেরিকা। অচেনা জায়গা থেকে আসা এই ফলটা আমাদের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে, ঠিক মোংলার মানুষগুলোর মতো। এ অঞ্চলের মানুষের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে বসতি গড়েছে। তাই হয়তো কারো কারো মুখে বরিশালের লোকাল একসেন্ট শুনলে এখানকার মানুষ আর অবাক হয়না। পথে আসতে চোখে পড়লো সেন্ট পলস্ স্কুল। ফাদার মারিনো রিগান গোড়াপত্তন করেছিলেন এই স্কুলের। স্কুলটা হয়তো এখনো ফাদার মারিনো রিগান কে মনে করে মন খারাপ করে।

কাল নতুন কর্মস্থলে প্রথম দিন, প্রথম ক্লাস।

আমার নতুন ছাত্র-ছাত্রী এসব ভেবে খানিকটা অস্থির লাগছে। এ অস্থির লাগাটাই আমার মন খারাপ লাগাটা কমিয়ে দিলো। বাসা গোছানোর টুকিটাকি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। ঘুম ভেঙে মনে পড়লো আমি আমার চেনা জগৎ থেকে অনেক দূরে আরেকটা জগতে চলে এসেছি।অনেকদিন আগে একটা লেখায় পড়েছিলাম "Nostalgia is a seductive liar" লেখকের নাম মনে নেই। কিন্তু কথাটা সত্য।

অদ্ভুত এক প্রাণী হচ্ছে মানুষ, যে কিনা হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।

মোবাইলে প্রবল আসক্তি শিক্ষার্থীদের জন্য মারাত্মক হুমকি

শেখ আনোয়ার হোসেন (পি আর এল)
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

বর্তমান যুগ প্রযুক্তি বিকাশের যুগ। প্রযুক্তি যাদের নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব আজ তাদের হাতের মুঠোয়। বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলি আজ প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করে শক্তি এবং সম্পদ অর্জনের পাশাপাশি কৌশলে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রযুক্তির এই বিপ্লব মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ দৃশ্যমান বাস্তবতা। প্রযুক্তি মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে বিপ্লব। অজানাকে জানতে, দুর্ভেদ্য রহস্যকে ভেদ করতে এবং যেকোনো কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এটি এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান সভ্যতায় প্রতিটি সমাজের মানুষ তাদের জীবন ধারাকে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আলোকিত করছে। এ প্রতিযোগিতায় কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে সেটাই তাদের লক্ষ্য। শিল্প, কৃষি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে এর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব এ প্রযুক্তি বিকাশেরই ফল। এ ছাড়া ফরাসি বিপ্লব ও বিশ্বের অনেক যুগান্তকারী ঘটনা প্রযুক্তি বিকাশের ফলে সংঘটিত হয়েছে। পরমাণু বোমা আবিষ্কার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস লীলা এরই দুঃখজনক উদাহরণ।

প্রযুক্তি মানব সভ্যতায় নিয়ে এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। এটি সভ্যতাকে যেমন আলোকিত করেছে, করেছে মহিমান্বিত। তেমনি এর বিষাক্ত ছোবলে সভ্যতা হয়েছে ক্ষত বিক্ষত। এর হাজারো সফলতায় আমরা যেমন গর্বিত হই তেমনি এর ব্যর্থতার দায়ও আমাদের উপরেই বর্তায়। সাম্প্রতিক সময়ে মানব জীবনের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারকারী অগণিত প্রযুক্তিগত ডিভাইসের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস হলো মোবাইল ফোন। কোনো সন্দেহ নেই এটি মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর মাধ্যমে মানুষ মুহূর্তেই পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের সাথে অপর প্রান্তের মানুষ কথা বলা, গান শোনা, সিনেমা দেখা, ভিডিও দেখা প্রভৃতি উপভোগ করে থাকে। বিশেষ করে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা মোবাইলের মাধ্যমে লেখাপড়া সংক্রান্ত অনেক জরুরী সমস্যা সমাধান করে থাকে। মোট কথা মোবাইল ছাড়া জীবন এখন প্রায় অচল। সমাজের প্রায় সকল শ্রেণির মানুষের জীবনে এটি একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তবে এটি যদি শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজন পূরণের কাজে ব্যবহৃত হতো তবে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু এটি যখন নিছক বিনোদন, ভিডিও গেম খেলা, জুয়া খেলা, বড় বড় বাজি ধরার মতো ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করা হয় তখন তা দুঃশ্চিন্তার কারণ না হয়ে পারে না। বিশেষ করে দেশের স্কুল কলেজের তরুণ শিক্ষার্থীরা লেখা পড়ার পরিবর্তে মোবাইলের প্রতি দুর্বার আকর্ষণে সম্মোহিত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এমনভাবে

লেগে থাকে যে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

একবার একটি গল্প পড়েছিলাম। গল্পের বিষয় ছিল কোনো এক গ্রাম্য হাটের দিন এক যাদুকর হাটের মানুষদের যাদু মন্ত্রে মুগ্ধ করে তাদের পকেটের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। আর হাটের লোকেরা সবাই হা করে তা দাঁড়িয়ে দেখছে। গল্পের বাস্তবতা যাই হোক এ ঘটনার সাথে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি বিশেষ করে নেট দুনিয়ার অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নেটের জগতে সম্মোহিত হয়ে অসহায়ের মতো চুপ চাপ দেখছে। গল্পের যাদুকরের মতো একজন নেট ইঞ্জিনিয়ার জানেন কীভাবে লক্ষ কোটি মানুষের সামনে তথ্য উপাত্তের মুলো ঝুলিয়ে তাদের কোটি ডলারের মনোযোগ দখল করা যায়। একজন মনোবিশেষজ্ঞ অলডাস হাক্সলির মতে, 'মানুষের অমনোযোগী হওয়ার ক্ষমতা অসীম এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয় বলে সে সহজে পরাধীন হয়ে যায়।' নিজের জীবনে যত ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা সবাইকে জানানো এবং অন্যরা সেখানে লাইক-কমেন্ট করল কিনা সেটাও একটা বড় আগ্রহের বিষয়। এভাবে নিজের মনোযোগ হারানো এবং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের এ গভীর আগ্রহকে মার্কিন বিশেষজ্ঞ মাইকেল গেল্ড হেবার 'মনোযোগের অর্থনীতি' বলে উল্লেখ করেছেন। তথ্য এখন আর দুষ্প্রাপ্য বিষয় নয়। এখন সত্যিকারে দুষ্প্রাপ্য বিষয় হলো মানুষের মনোযোগ। সে কারণে এখন নেট ইঞ্জিনিয়াররা মানুষের মনোযোগ দখল প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। মানুষকে কে কতটা স্ক্রিনে আটকে রাখতে পারে সে প্রতিযোগিতা চলছে। এ ক্ষেত্রে শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় তথ্যেল চাহিদা পূরণ করলে খুব বেশি মনোযোগ পাওয়া যায় না। আর এই বেশি মনোযোগ পেতে হলে দরকার অপ্রয়োজনীয় তথ্যের চাহিদা তৈরি করা। সে জন্য চাই অর্থহীন মজাদার তথ্য ভাণ্ডার। যা দ্বারা অপ্রয়োজনীয় চাহিদা তৈরি করে অকারণ সময় নষ্ট করার জন্য যা দরকার নেট ইঞ্জিনিয়াররা সেই কৌশল উদ্ভাবন করে সেগুলি বিজ্ঞাপন দাতাদের নিকট মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেন।

একজন মানুষ দৈনিক গড়ে যে এক ঘণ্টা ইউটিউব ব্যবহার করে তার ৩০% ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজনে। বাকি ৭০% সময় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাকে যেভাবে দেখতে বলে সে সেভাবে দেখে। অবশ্য এ ব্যাপারে সে কোনো প্রকার জোর করে না। বরং সে তার পছন্দ, অপছন্দ, ক্লীক প্যাটার্ন, মাউস ধরার ভঙ্গি সবই জানে। ফলে সে মনোযোগ পাওয়ার আশায় পছন্দের ভিডিওগুলো স্ক্রিনের এক পাশে সাজিয়ে রেখে তাকে প্রলুব্ধ করতে থাকে। একটাতে আকর্ষণ হারিয়ে গেলে সাথে সাথে আরেকটি দিয়ে যাতে টেনে ধরা যায়। এভাবে একের পর এক ক্লিক করা বা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকাটা এক সময় আর তার নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। মানুষ এই অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় ও ভুল তথ্যের বিজ্ঞাপনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফাঁদে পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুর্বার আকর্ষণে সম্মোহিত হয়ে মোবাইলের স্ক্রিনে আঠার মতো গেলে থাকে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হয় না। এতে লাভবান হয় বিজ্ঞাপন দাতা, নেট ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানি এবং হাজারো সংস্থা। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মানুষ। বিশেষ করে তরুণ শিক্ষার্থীরা। সময় মতো তাদের খাওয়া এবং ঘুম হয় না। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকে। তৈরি হয় দুশ্চিন্তা, মানসিক অবসাদ। বাস্তব পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। শিক্ষার্থীদের

লেখাপড়া ও দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হয়। শুধু তাই নয় ধীরে ধীরে বাবা-মা ও অন্যদের সাথেও সম্পর্কের অবনতি হয়, মেজাজ খিটখিটে হয় এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক।

এ প্রসঙ্গে বর্তমান শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে দুটি কথা বলা জরুরি। বর্তমানে খুব কম শিক্ষার্থী আছে যাদের একটি স্মার্ট ফোন নেই। কলেজে ক্লাস চলাকালীন সময় অনেক শিক্ষার্থী ক্লাসে না গিয়ে অন্যত্র বসে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। তারা যে লেখাপড়া বা দরকারি কাজে তা ব্যবহার করছে তা নয়। নিছক বিনোদন ও অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করছে। অনেক সময় শিক্ষক ক্লাসে পাঠদান করছেন আর শিক্ষার্থী পিছনে বসে মোবাইল টিপছে। নোটিশ দিয়ে বারবার সতর্ক করেও এখান থেকে তাদের ফেরানো যাচ্ছে না। অনেক অভিভাবক এ ব্যাপারে তাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন। ফোন কিনে না দিলে তাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া বন্ধ করবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে। কয়েক দিন আগে আমাদের একজন শিক্ষার্থী তার বাবা ফোন কিনে দিতে পারেননি বলে ক্ষোভে আত্মহননের মতো দুঃখজনক পথ বেছে নিয়েছে। আর একজন মেধাবী শিক্ষার্থী অকপটে স্বীকার করছে, সে মোবাইলে দুর্বার আকর্ষণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কিন্তু এর শেষ কোথায়? অভিভাবক, শিক্ষক, রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্মিলিত উদ্যোগে এখনই কঠোর পদক্ষেপ না নিলে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হবে শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজ।

প্রযুক্তি তার গতিতে এগিয়ে যাবেই। তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। মানুষের বিপদটা হলো এভাবে বেকুবের মতো চুপচাপ প্রযুক্তির দাসে পরিণত হওয়া। বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজ, যারা আগামীতে জাতির নেতৃত্ব দিবে। নেট দুনিয়ার এই চটকদার বিজ্ঞাপন থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে অভিভাবক, শিক্ষক, রাষ্ট্র ও সমাজ সকলকে এক যোগে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সবার মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রযুক্তির লাগাম টেনে ধরে তাকে কল্যাণকর লক্ষ্যে ব্যবহার করতে না পারলে নিশ্চিতভাবে ভয়াবহ বিপর্যয় আসন্ন।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা

আ ই শ ম বাকী বিল্লাহ
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মোংলা সরকারি কলেজ

মানবাধিকার শব্দটি মানব এবং অধিকার এদুটি শব্দের সমন্বিত রূপ। মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সর্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকারই হলো মানবাধিকার। মূলতঃ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোকেই মানবাধিকার বলে। মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সর্বোচ্চ সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণ অধিকার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মর্যাদা ও অধিকার বাস্তবায়নে অসংখ্য নবী-রাসুল এ ধরা পৃষ্ঠে প্রেরণ করেছেন। ইসলামই সর্বপ্রথম মানবাধিকারের সুনির্দিষ্ট ধারণা মস্তিষ্কে জন্ম দিয়েছে এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধকে 'কবিরা গুনাহ বা মহাপাপ' বলে ঘোষণা করেছেন।

মানবাধিকার একজন ব্যক্তির মর্যাদা ও আত্মসম্মানের সাথে জড়িত একটি বিষয়, যা মনুষ্য সমাজের নৈতিক মানদণ্ডকে প্রকাশ করে। এটি কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নয় বরং গোটা বিশ্ব সমাজের মানমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। কাজেই মানবাধিকার সমুন্নত রাখার দায়িত্ব ব্যক্তির তো বটেই, বিশ্ব সমাজেরও। বিশ্ব ভূখণ্ডে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমানে UDHR, ও CCPR, DRD সহ প্রমুখ বিশ্ব সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

এছাড়া প্রতিটি রাষ্ট্র এর সংরক্ষণের জন্য নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে যাচ্ছে। তথাপিও আজ বিশ্ব ভূখণ্ডে মানবতা ও মানবাধিকার ভুলুণ্ঠিত। বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার মোড়ল দাবীদার আমেরিকা নিজেদেরকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বিরল দাবি করলেও দেখা যায় সেখানে ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত নয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রের সংবিধানে মানবাধিকারকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোথাও মানবাধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি।

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে কালজয়ী চিরন্তন আদর্শ হিসাবে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই সকল যুগে মানবাধিকার সুনিশ্চিত করেছে। অসীম জ্ঞানময় নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলামই মানবাধিকার নিশ্চয়তার গ্যারান্টি। আজকের বিশ্বে মানবাধিকারের যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের বিকল্প নেই। ইসলামে জীবন দর্শন যেমনি পরিপূর্ণ, ইসলামে মানবাধিকার ধারণাও তেমনি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ। ইসলাম মানবাধিকার সংরক্ষণে যে বিধান আরোপ করেছে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র

পরিবেশন করছি।

❋ জীবনের নিরাপত্তার অধিকার :

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষের বেঁচে থাকার তথা জীবনের নিরাপত্তার অধিকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলাম আদালতে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ও আদালত কর্তৃক শাস্তি ঘোষণা ব্যতীত কোনো মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করাকে সমস্ত মানবকূলের হত্যার সমতুল্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি কোনো কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করল অথবা, জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল, সে যেন সমস্ত মানব মণ্ডলীকে হত্যা করল। (সুরা মায়েদা আয়াত : ৩২)

❋ অমুসলিমদের ধর্ম পালনের অধিকার :

ইসলামী রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের লোক স্বাধীন ও নিরাপদে বসবাস করার এবং নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলাম প্রত্যেক ধর্মের সদস্যদের নিন্দাবাদ ও গালমন্দ করাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ করছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা আল্লাহকে ব্যতীত অন্যকে ডাকে তোমারা তাদেরকে গালি দিও না।'

ইসলাম সংখ্যালঘুদের নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার এবং তাদের সম্পদ ও ধর্মীয় উপাসনালয়ের পূর্ণ নিরাপত্তার বিধান অক্ষুণ্ন রেখেছে। সংখ্যালঘুদের প্রতি কোনো ধরনের অমানবিক আচরণ ইসলাম সমর্থন করে না। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এ সম্পর্কে এরশাদ করেন, 'সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিক বা সংখ্যালঘুকে অত্যাচার করে, তাদের অধিকার খর্ব করে, তাদের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেয় কিংবা জোরপূর্বক তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ দায়ের করবো। (সুনানে আবু দাউদ)

❋ নারীর মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার :

প্রকৃত পক্ষে ইসলামই নারীর মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ করেছে। মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত ঘোষণা দিয়ে নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। হাদিসে উল্লেখিত যে, জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নালোকে রাসুলুল্লাহ (সঃ) প্রথম তিন বার মায়ের সেবা করার কথা বলেছেন, অতঃপর চতুর্থবারে পিতার সেবা করার কথা বলেছেন। আল কোরআনে নারী-পুরুষ একে অপরের পোষাক বলে মন্তব্য করেছেন। ইসলাম প্রতিটা কন্যা সন্তানকে এক একটা জান্নাত বলে অভিহিত করেছে। নারী অধিকারের বিষয় মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন-নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে পুরুষদের ওপর, যেমন পুরুষদের আছে তাদের (নারীদের) ওপর। (সুরা বাকারা : ২২৮)

জাহেলিয়াতের যুগে নারী জাতি ছিল চরম নির্যাতিত। তাদের মানবীয় ন্যায্য অধিকার ছিল ভূলুণ্ঠিত। অর্থ সম্পদকে পুরুষ নিজেদের মালিকানা স্বত্ব মনে করত। উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে নারীদের ছিল না কোনো নির্ধারিত অংশ। স্বামীর মৃত্যু বা তালাক প্রাপ্ত হওয়ার পর ছিল না দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি। আরবীয় সমাজে নারী জন্মকে চরম অবমাননা, লাঞ্ছনা ও ঘৃণার কারণ মনে করা হতো। নারী জন্মের প্রতি তাদের ঘৃণা এতই প্রবল ছিল যে, নিষ্ঠুর পিতা নির্দয়ভাবে নিজ কন্যাকে জীবন্ত প্রোথিত করত। নারীর প্রতি এহেন অবহেলার ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে মহানবী (সঃ) এরশাদ করেন, 'সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান যার প্রথম সন্তান হচ্ছে কন্যা।' ইসলাম নারীকে যে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তা বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে বিরল।

❋ ন্যায্য বিচার প্রাপ্তির অধিকার :

ইসলাম ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের সুবিচার প্রাপ্তির এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতার বিধান আরোপ করেছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করো, এটা তাকওয়ার নিকটবর্তী। (আল কোরআন) হাদীসে উল্লেখ আছে যে, পানি সেচ দেওয়া নিয়ে এক মুসলিম ও বিধর্মীর সাথে ঝগড়ার সৃষ্টি হলে রাসুল্লাহ (সঃ) সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ঐ বিধর্মীর পক্ষে বিচারের রায় দেন। ফলে মুসলিম ব্যক্তিটি নাখোশ হয়ে হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট আপিল করলে হযরত ওমর (রাঃ) অপরাধী ব্যক্তির গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দেন। এই বিচার ব্যবস্থা দ্বিতীয়টি আজো দেখা যায় না। মহান রাব্বুল আলামিন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে এরশাদ করেন, 'তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা কর তখন ন্যায় পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।' (সুরা নিসা : ৫৮)

❋ শ্রমিকের অধিকার :

ইসলাম শ্রমিকের অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সোচ্চার। শ্রমিক যেন তার প্রাপ্য অধিকার যথাযথ পায় এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সঃ) কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' মালিক ও শ্রমিকের মাঝে কোনো রূপ বৈরিতা সৃষ্টি হতে দেয়নি। মহানবী (সঃ) ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন 'শ্রমিকেরা তোমাদের ভাই, তোমরা যা খাবে তাদেরও তাই খেতে দিবে, তোমরা যা পরবে তাদেরও তাই পরতে দেবে।

❋ মতামত প্রকাশের অধিকার :

নির্বিঘ্নে সত্য ও স্বাধীন মত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার ইসলামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সত্য গোপন করে মিথ্যা প্রকাশের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি দিয়েছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য ও স্বাধীন মতামত প্রকাশ করাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলে ঘোষণা দিয়েছে। কোনো ব্যক্তি সত্য ও

স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের হাতে নিহত হওয়াকে শহীদ বলে ঘোষিত হয়েছে।

❊ দুস্থ-অসহায়ের অধিকার :

দুস্থ-অসহায় মানুষের জীবন মান সংরক্ষণের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা ধনীদের সম্পদে গরিবের হক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোনো ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার ওপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে।

❊ আধুনিক যুগে মানবাধিকার :

পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানবাধিকারের ধারণাটি প্রথম জন্ম হয় ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এর ফলে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে সর্বপ্রথম ঘোষিত হয় Declaration of the People's Right এবং ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সংযোজিত হয় The Bill of Rights এরপর থেকে মানবাধিকারের ধারণাটি সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে বিকশিত হয় এবং ধীরে ধীরে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানবাধিকার প্রসঙ্গটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হতে থাকে। এর ফলে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ৩০টি ধারা সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ ঘোষিত হয়। এ ঘোষণায় বিশ্ববাসীর মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদটি কোনো রাষ্ট্রের উপর বাধ্যতামূলক করা না হলেও ক্রমান্বয়ে তা বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হতে থাকে। আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গঠিত হয়েছে মানবাধিকার কমিশন। এসব কমিশন নিজ নিজ দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি আজ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মানবাধিকার যেন ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা পৃথিবীর সর্বত্র ক্রমাগত ঘটেই চলছে। আজকের আধুনিক সভ্য যুগে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে, সেখানে মহানবী (সঃ) অজ্ঞতা ও অন্ধকার যুগে কলুষিত সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় শতভাগ সফল হয়েছিলেন।

মুসলমানরা উত্তর আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করলে সেখানকার বর্বর জাতির মতো দুর্ধর্ষ ও হিংস্র জাতির মধ্যেও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা স্পেন বিজয় করলে ইউরোপ ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত সামন্ত রাজাদের দুঃশাসন ও অত্যাচারের হাত থেকে সেখানকার সাধারণ মানুষ মুক্ত হয়। তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এছাড়া মধ্য এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বর্ণবাদ ও কুসংস্কার দূরীকরণেও ইসলামের ভূমিকা অপরিসীম।

মানবতার কল্যাণকামী জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাও মানব জাতির কল্যাণ সাধন

এ জীবন ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলাম মানবতার সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বদা সরব। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা হকদারের প্রাপ্য হক আদায় করে দাও। প্রাচীন ও আধুনিক কোনো ইতিহাসই এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেখেনি, যা ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্ববাসীদের মাঝে ভারসাম্য স্থাপন করেছে। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্মীয় ব্যবস্থাই ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার আদায়ে অপারগতা প্রকাশ করেছে। ইসলাম পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষকে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে, অনুরূপভাবে ইসলাম শ্রেণিগতভাবে মুসলমান ও অমুসলিমের উল্লেখ করে সকল শ্রেণি ও ধর্মের আধিকার দিয়েছে। সবিশেষ উল্লেখ্য, একমাত্র ইসলামই মানবাধিকারের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রীয়ভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

প্রকৃতিকবি ও মানবকবি কালিদাসের ঋতুসংহার

ড. অপর্ণা অধিকারী
প্রভাষক, সংস্কৃত বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

মহাকবি কালিদাস তাঁর অমর সৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যকে এক সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে একাসনে বসার যোগ্যতা প্রধানত কালিদাসের সাহিত্যকীর্তির দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এহেন বিশ্ববন্দিত মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যে নাটকে কোথাও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেননি।

কিংবদন্তী ও অনুমান অবলম্বন করে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁর আবির্ভাবকাল ও জীবনকথা সম্পর্কে বহুবিধ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রচলিত জনমত অনুসারে তিনি ছিলেন উজ্জয়িনীর কবি। যে নয়জন মহামনীষী মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন, কালিদাস ছিলেন তাঁদের মুকুটমণি। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক তাঁর আবির্ভাবকাল। কাব্যই কবির জীবনদর্শন। কাব্যের মধ্যেই কবিসত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ। কালিদাসের কাব্যই তাঁর প্রকৃত পরিচয়, তাঁর মহত্ত্বের প্রমাণ। প্রধানত তিনখানি নাটক – অভিজ্ঞানশকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশীয় এবং চারখানি কাব্য– রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও ঋতুসংহার কালিদাসের নামে প্রচলিত। ঋতুসংহার মহাকবির প্রথম জীবনের রচনা।

কাব্যপ্রকৃতি ও নামকরণ :

ঋতুসংহার একখানি খণ্ডকাব্য। সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা প্রণয়ন করেছেন তাঁদের আলোচনায় এটি গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত। সমগ্র কাব্যখানি ছয়টি সর্গে বিভক্ত। এক–একটি সর্গে এক–একটি ঋতুর বর্ণনা আছে। নাটকে কালিদাসের কবিত্ব- প্রতিভা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার স্বল্প অংশই এতে অনুভূত হয়। ঋতুর পরিবর্তনে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্য প্রকাশেই এই কাব্য থেমে থাকেনি– সেই সঙ্গে মানব মনেও যে বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তার সার্থক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই কাব্যে। বিশেষতঃ প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়বৃত্তিতে ঋতুর পরিবর্তন যে ভাববৈচিত্র্য আনে তা খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে কালিদাসের এই প্রথম প্রয়াসে। এক কথায় বলা যায়, প্রকৃতি এবং মানবজগৎ - দুই যেন মিলে-মিশে চলেছে এই কাব্যে। প্রকৃতিকবি কালিদাসের 'ঋতুসংহারে' গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের বর্ণনা এবং প্রাণিকুলের শোচনীয় অবস্থার চিত্র যে ভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা এক কথায় অপূর্ব।

ঋতুসংহার শৃঙ্গার-রসের কাব্য। তাই প্রতিটি বর্ণনার মধ্যে কবির শৃঙ্গার-উদ্দীপনের সর্বাত্মক প্রয়াস রয়েছে। সংহার কথার সাধারণ অর্থ 'বধ'। কিন্তু এর অন্য আরো অর্থ আছে এবং তার মধ্যে 'সংক্ষেপ' এই অর্থের গ্রহণ হয়েছে ঋতুসংহার নাম-করণে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, প্রভৃতি ষড়ঋতুর বর্ণনা এই কাব্যের উপজীব্য। তাই নাম ঋতুসংহার। মোটামুটিভাবে দেড়শ শ্লোক আছে এই কাব্যে। ঋতুবৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে যে কাব্যে তার নামকরণ ঋতুসংহার হওয়া স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংঙ্গত। [১]

বিষয়সমীক্ষা :

ঋতুসংহার কাব্যে ভারতবর্ষের ছয় ঋতুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে অতি সুন্দরভাবে। নিম্নে ছয়টি সর্গের ছয়টি ঋতুর সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়া হলো–

প্রথম সর্গ, গ্রীষ্ম ঋতু :

গ্রীষ্মের নিসর্গ-প্রকৃতির দুটি রূপ, একটি ভয়ঙ্কর, অন্যটি মনোরম। মনোরম রূপটি প্রধানতঃ অপরাহ্ন আর রাত্রিকালের। গ্রীষ্মের রাত্রিতে চন্দ্রের কিরণ, সুবাতাস, সূক্ষ্ম বসনে ভূষিত প্রিয়ার সান্নিধ্য, তন্ত্রীয় লয়-সমন্বিত সঙ্গীত অতীব সুখদায়ক। জলশয়ে অবগাহন এখন সকল সময়েই সুখপ্রদ। চন্দন, ব্যজন(পাখা), শীতল চন্দ্রকান্তমণি, প্রভৃতি এখন উপভোগের বিষয়। সুরম্য অট্টালিকায় শায়িত যুবতীর নিভৃত প্রকোষ্ঠেও বাতায়ন এখন উন্মুক্ত। জলাশয়ে এখন নয়নমনোহর পদ্মের শোভা,বাতাস এখন পাটলকুসুমের(শ্বেতরক্তবর্ণ) গন্ধে ভরপুর। গ্রীষ্মের দাবদাহে অবসন্ন প্রকৃতির রুক্ষ রূপটি এখন ভয়ঙ্কর। প্রবল রৌদ্রজ্বালার কাছে বিরহের জ্বালাও অকিঞ্চিৎকর। প্রাণিকুলের প্রাণ তৃষ্ণায় এবং রৌদ্রতাপে ওষ্ঠাগত। আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষায় তারা বিব্রত। খাদ্যখাদক বা ঘাত্যঘাতক সম্পর্কের সীমানা এখন অবলুপ্ত। পথের তপ্ত ধূলোয় বিপন্ন সাপ তার খাদক ময়ূরের কলাপের তলায় আশ্রয় খোঁজে। হাতের মুঠোয় খাবার পেয়েও অবসন্ন ময়ূরের খাদ্যগ্রহণে স্পৃহা থাকে না। বিপর্যস্ত সিংহ হাতিকে কাছে পেয়েও হত্যায় মেতে ওঠে না। তৃষ্ণার্ত হাতিরও আজ সিংহ দেখে ভয় করে না। উত্তপ্ত পঙ্কিল জলাশয় থেকে মণ্ডূক এখন উঠে আসে, আশ্রয় নেয় তার খাদক সাপেরই ফণার তলায়। রৌদ্র-জ্বালায় অস্থির সাপ তার খাদ্যকে কাছে পেয়েও গ্রহণ করে না। বিষ, রৌদ্রতপ্ত মণি এবং সূর্যকিরণের জ্বালায় তার অস্তিত্ব বিপন্ন। জিভ দিয়ে সে এখন বায়ু গ্রহণ করে। তৃষ্ণার্ত হরিণ জলের আশায় ঘুরে মরে। খাবারের অন্বেষণে শূকরকে এখন যেতে হয় শুকনো পাঁকের গভীরে। জলকেলিতে মেতে ওঠে হাতির পাল। জলাশয়ের জল পঙ্কিল হয়ে যায়, ছিন্নমূল হয় মৃণালদণ্ড (পদ্মাদির নালস্থ সূত্র), মাছের বিপদ বাড়ে, সারসের দল পলায়ন করে। পিপাসার্ত বন্য মহিষ পর্বতকন্দর থেকে নির্গত হয় জলের আশায়। গাছেরপাতা এখন নীরস, শস্যের অঙ্কুর বিনষ্ট, জলাশয় জলশূন্য। পাখিদের দীর্ঘশ্বাস ওঠে, বানরেরা লতাকুঞ্জে আশ্রয় নেয়, গবয়ের দল জল খোঁজে, শরভের (মৃগ, হাতি, বানর, উট প্রভৃতি) দল অতিকষ্টে জলাধারের জল তোলে। বনানীর শোভা ভয়ঙ্কর। দাবাগ্নির দহনে বনভূমি প্রজ্জ্বলিত। সে আগুনের আঁচ লাগে পাহাড়ের গুহায়, বাঁশের বনে, এমন– কি শ্যামল তৃণভূমিতে। সে আগুন কোথাও সিঁদুরের মতো লাল, কোথাও সোনার মতো উজ্জ্বল। দাবাগ্নির দহনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে হরিণের দল। অর্ধদগ্ধ হাতি, গবয়,

সিংহ প্রাণরক্ষায় প্রয়োজনে পরস্পর শত্রুতা ভুলে একসঙ্গে আশ্রয় নেয় তটিনীর বুকে ও তার বিস্তৃত তটপ্রদেশে। গ্রীষ্ম কামসাধনার ঋতু নয়। সে এখন উপশান্ত-মন্মথ। তাই নারীপ্রকৃতির রতিবিহারের কোনো উদ্দামতা নেই। রমণীর লাক্ষারঞ্জিতচরণে নূপুরের ঝংকার, পদসঞ্চারে হংসধ্বনির অনুরণন, প্রশস্ত নিতম্বে স্বর্নময় সূক্ষ্ম পরিধেয়, কটিদেশে মনোরম মেঘলা, হারের ভূষণ এবং সূক্ষ্ম বসনের সামান্য আচ্ছাদন। সবই যেন নিদ্রামগ্ন কামদেবের জাগরণের নিমিত্ত বৈতালিকের নিবেদিত পূজা-উপচার। যুবচিত্তে ব্যাকুলতা আসে বৈ কি! তদুপরি আছে বিলাসিনী রমণীর মৃদূ হাসি, কুটিল ভ্রুভঙ্গি এবং অঙ্গের বিলাস। প্রবাসী পুরুষের হৃদয়ে মুকুলিত হয় কামচেতনা।

দ্বিতীয় সর্গ, বর্ষা ঋতু :

বর্ষা জলবর্ষণ ও বিরহের ঋতু। রাজকীয় সমারোহে তার আগমন। মেঘের গুরু গুরু গর্জন, বিদ্যুতের চমক, সারি সারি কাজল-কালো মেঘের আনাগোনা এবং ঘন ঘন বজ্রপাতে আকাশ-বাতাস আলোড়িত। বর্ষা যেন বীর যোদ্ধা, বিদ্যুতের ছিলা-পরানো ইন্দ্রধনু তার হাতে, অজস্র ধারায় বারিপাত তার শরবর্ষণ। প্রবাসী পুরুষের বিরহী হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় ধারাপাতের শরাঘাতে।

বর্ষা চাতকের মুখে জল দেয়, কৃষকের মুখে হাসি ফোটায়, ধরণীর বুকে সবুজের সমারোহ নিয়ে আসে, ময়ূর-ময়ূরীর মনে মত্ততা জাগিয়ে তোলে। ইন্দ্রনীল-কীটে ধরণী রত্নভূষিত হয়, চকিত হরিণের সমারোহে পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে সৈকতময় বনভূমি।

প্রবল বেগে দুই তীর বিধ্বস্ত করে অফুরন্ত পঙ্কিল জলধারা নিয়ে আঁকাবাঁকা পথে নদীগুলি ছুটে চলে সমুদ্রের দিকে। কচি ঘাসের শ্যামলিমায় নতুন পাতায় সজ্জিত বৃক্ষের শোভায় এবং হরিণের স্বচ্ছন্দ বিচরণে নয়নমনোহর হয়ে ওঠে বিন্ধ্যপর্বতের বনভূমি। পদ্মভ্রমে ভ্রমর গুজন করে ময়ূরের চক্রাকার কলাপের বনে, মদমত্ত হাতির মদপুরিত গণ্ডস্থলে। সন্ত্রস্ত মণ্ডূক নদীজলের গতিবেগের প্রবলতা নিরীক্ষণ করে। মেঘের গর্জন শুনে পাল্টা গর্জন করে বুনো হাতির পাল। পাহাড়ের মাথায় মেঘ লাগে, চারিদিকে বয়ে চলে নির্ঝরীণি, ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করে। বাতাস এখন শীতল এবং কদম্ব, শাল, অর্জুন ও কেতকীকুসুমের গন্ধে সুবাসিত। কুসুমের সম্ভারে বনে বনে আনন্দের হিল্লোল, মৃদুমন্দ বাতাসের আন্দোলনে বৃক্ষ শাখায় নৃত্যের ছন্দ, কেতকীফুলের কাঁটায় বনভূমির আনন্দ-হাসির উচ্ছ্বাস।

বিদ্যুতের ঝলকানি এখন অভিসারিকা নায়িকার নৈশ অভিসারের আলোকবর্তিকা। মেঘের গর্জনে ভয়ার্ত নারীকুল ভুলে যায় দয়িতের অপরাধের কথা। প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার চোখের কোণে জলের ধারা। তার বনমালা, আভরণ বা সুগন্ধি দ্রব্যের অনুলেপন নেই।

বর্ষা পত্নীপ্রেমের অনুরাগ-ভরা নায়কের মতো অজস্র ফুলের উপহার নিয়ে আসে রমণীদের কাছে। বিলাসিনী রমণীর মাথায় এখন কদম্ব, বকুল ও কেতকীর মালা, অর্জুনফুলের কুঁড়ি তাদের কানে, পরিধানে শ্বেত সূক্ষ্ম বসন। বৃষ্টির ছোঁয়া লেগে সুন্দরী ললনার কটিদেশে উন্মুক্ত ত্রিবলীরেখায় রোমাঞ্চ ফুটে ওঠে। তাদের হারে-ঢাকা বক্ষ,সুরাপুরিত অধর, লম্বিত কেশ, মণিময় মেখলা পুরুষ–

চিত্তে অনুরাগের জোয়ার আনে। সন্ধ্যায় গৃহবধূ কোমল অঙ্গে অগুরু চন্দনের প্রলেপ দেয়, বর্ষণের আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি গৃহকার্য সমাধা করে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে।

তৃতীয় সর্গ, শরৎঋতু :

শরতের নিসর্গপ্রকৃতি সদ্য-বিবাহিতা রমণীর মতো। তার অঙ্গে পাকা শালিধানের লাবণ্য, পরিধানে শ্বেত কাশফুলের বসন, বিকশিত পঙ্কজ তার মুখমণ্ডল, হংসকুলের মধুর কলধ্বনি তার নুপুরের নিক্কণ, পাকা ধানের ক্ষীণ অবয়ব তার কটিদেশের সূক্ষ্মতা। হাঁসের মধ্যে এখন রমণীর গতি, নীলপদ্মের মধ্যে রমণীর মধুর দৃষ্টিপাত, নদীর তরঙ্গমালায় ভ্রুবিলাসের প্রতিচ্ছবি, কুসুম আর কিশলয়ে সমৃদ্ধ কৃষ্ণকায় বল্লরীর মধ্যে অলংকৃত বাহুর শোভা, দন্তবিকশিত মৃদু হাস্যের প্রতিচ্ছবি, অশোক আর নবমালতীর মধ্যে। চাঁদের আলো, হাঁসের মালা এবং কাশ-কুমুদ-ছাতিম আর মালতীফুলের শুভ্রতায় দিনে-রাতে, জলে-স্থলে অরণ্যে সর্বত্র এখন শ্বেতবর্ণের সমারোহ। মন্থরগতি-নদীর বুকে বিশাল চড়া, তীরে তীরে হাঁসের মেলা, জলের মধ্যে পুঁটিমাছের খেলা। আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ। তারা যেন আকাশরাজ্যের চামর! বন্ধুকফুল আর পাকাধানে বনপ্রান্তর রঞ্জিত। ফুল ফুটেছে কোবিদার গাছে, মত্ত মধুকর তার মধুপানে রত। চন্দ্রমুখী রাত্রি এখন বালিকাবধূর মতো দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। নদীর জলে রক্তকমল; তার মধ্যে বালিহাঁস খেলা করে। মৃদু মন্দ বাতাসের কাঁপন এখন শালিধানে, বড়ো বড়ো ফুলের গাছে আর পদ্মের বনে। যেখানে জল সেখানেই বিচিত্র পদ্ম আর মরালের (রাজহংস) কাকলি। এখন আর ইন্দ্রধনু নেই, নেই সেই বিদ্যুতের ঝল্‌সানি। আকাশে নেই বলাকা, উল্লসিত ময়ূরের আকাশপানে-চাওয়া। কামনার মত্ততা এখন হংসদলে, পুষ্পের সম্ভার এখন সপ্তপর্ণে। উদ্যানে শিউলিফুলের গন্ধ, বহুবিচিত্র পাখির কূজন আর মৃগীকুলের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। সকালে শীতল বাতাস বয়; কহ্লার ,পদ্ম আর কুমুদের প্রান্ত থেকে শিশির ঝরে। মাঠে মাঠে শালিধানের ক্ষেত, গোরুর পাল, কাকলিমুখর সারস আর হাঁসের দল।

শরতের পরিবেশ অতি মনোরম। বাতাস এখন শীতল, আকাশ চন্দ্রতারায় সমুজ্জ্বল, জল মালিন্যমুক্ত, পথ কর্দমশূন্য, মেঘ জলশূন্য। প্রভাতে সূর্যের উদয়ে সুন্দরী যুবতীর হাসির মতো পদ্ম বিকশিত হয়, নায়কের বিসর্জনে নায়িকার মতো চন্দ্রের বিলয়ে ম্লান হয়ে যায় কুমুদফুল।

শরতের ঐশ্বর্য তার পুষ্পের সম্ভারে। মালতীফুল এখন রমণীর কেশসজ্জায়, নীলপদ্ম তাদের কানে। শরতের কুসুমসমৃদ্ধ মনোরম পরিবেশে যুবক-যুবতীর চিত্তে প্রেমের উৎকণ্ঠা কুসুমিত হয়। প্রবাসী পথিক সর্বত্র প্রিয়া-অঙ্গের সাদৃশ্য অনুভব করে, বন্ধুকফুলের মধ্যে প্রিয়তমার অধরশোভা দর্শন করে সে আত্মহারা হয়ে পড়ে। প্রফুল্ল পদ্মের মত যার মুখ, নীলপদ্মের মতো যার চোখ, সদ্য ফোটা কাশফুলের মতো শুভ্র বসন যার পরিধানে, এবং কুমুদের মতো রমণীয় যার কান্তি সেই প্রমত্তা কামিনীর মতো এই শরৎকাল সবার মনে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ বিধান করুক।

চতুর্থ সর্গ, হেমন্ত ঋতু :

হেমন্ত সম্ভোগের ঋতু। নবপত্রের উদ্‌গমে শস্যক্ষেত্র এখন রমণীয়, লোধ্রগাছে ফুল, শালিধান পেকেছে, শিশির-ঝরা সকালবেলায় পদ্মফুলের মলিনতা। মাঠে মাঠে হরিণের অবাধ বিচরণ, ক্রৌঞ্চমিথুনের নিনাদের মুখরতা স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ সরোবর রাজহাঁসের কলধ্বনিতে মুখরিত এবং নীলপদ্মে সুসজ্জিত। শৈত্যকবলিত প্রিয়ঙ্গুলতায় পাণ্ডুরতা। কামিনীদের বক্ষ কুঙ্কুমরাগে আরক্ত ও মুক্তামালায় শোভিত। বাহুতে তাদের বলয় ও অঙ্গদ নেই, অঙ্গে নেই সূক্ষ্ম বসন, নিতম্বে নেই মেঘলা, চরণে নেই নূপুর। তাদের অঙ্গে প্রিয়- সম্ভোগের উপযোগী কৃষ্ণচন্দনের অনুলেপন, মুখপদ্মে পত্রাবলী, মস্তকে অগুর-চন্দন। নারীর বসন-ভূষণ-শয়ন-উত্থান-সবই এখন রতিকেন্দ্রিক। প্রভাতের শিশিরবিন্দু যেন রতিপীড়িত হেমন্তের ক্রন্দন। অত্যন্ত মনোরম এই শীতল হেমন্তকাল বিবিধ গুণে রমণীয়, রমণীকুলের চিত্তহারী। গ্রামপ্রান্তর এখন শালিধানে পরিপূর্ণ, চারিদিকে এখন বকের মেলা।

পঞ্চম সর্গ, শীতঋতু :

হেমন্তের মতো শীতকালও সম্ভোগপ্রধান। এখন শালিধান ও আখের প্রাচুর্য। ক্রৌঞ্চমিথুনের নিনাদের চতুর্দিক মুখরিত। বদ্ধ ঘরের আবদ্ধ পরিবেশ, আগুন ও সূর্যের উত্তাপ, স্থূল বসন এবং যুবতীবধূর সান্নিধ্য এখন বিলাসী পুরুষের উপভোগের বিষয়। এখন আর ভালো লাগে না চন্দনের প্রলেপ, স্বচ্ছ প্রাসাদতলে ভূমিশয্যা, শীতল বাতাস এবং শৈত্যজর্জর রাত্রিকাল। নারী-অঙ্গের বসন-ভূষণে এখন প্রিয়মিলনের উপযোগী পারিপাট্য, কামদেব এখন গর্বিত। যাদের প্রিয়জন বিচ্ছিন্ন সেই রমণীদের কাছে এই ঋতু মনোবেদনার কারণ। এখন গুড়জাত মিষ্টদ্রব্যের প্রাচুর্য, সুস্বাদু শালিধান ও আখে এই ঋতু রমণীয়।

ষষ্ঠ সর্গ, বসন্তকাল :

বসন্ত ঋতুকুলের রাজা। রাজকীয় তার ঐশ্বর্য। নারীহৃদয় জয় করার জন্যে যোদ্ধার বেশে তার আবির্ভাব। আখের মুকুল সেই, যোদ্ধার অজস্র শর, ভ্রমরের মালা তার ধনুর্গুণ। সহকার ও অশোকের ডালে ডালে কচি পাতা আর মুকুলের সমারোহ। ফুলে ফুলে মৃদু বাতাসের কম্পন আর ভ্রমরের গুঞ্জণ। কুরবক শাখায় নতুন পাতা, পলাশের বনে লাল ফুলের অগ্নিশোভা, আমের বনে কোকিলের মধুর কূজন। সাদা কুন্দফুলে উদ্যান সজ্জিত। পর্বতের সানুদেশে জানা-অজানা ফুলের বাহার, কোকিলের কুহুধ্বনি আর সারিবদ্ধ পাহাড়ীগাছের শোভা। এখন আর শিশিরপাত নেই, চাঁদে মালিন্য নেই। কর্ণিকার এখন কুসুমিত, দীঘির জলে পদ্ম বিকশিত।

বসন্তসখা কামদেবের প্রভাব এখন সর্বত্র। প্রাণীকুল প্রণয়ক্রীয়ায় মত্ত। কোকিল-কোকিলাকে প্রণয় নিবেদন করে, ভ্রমর ভ্রমরীকে চাটুকথা শোনায়। কুসুম্ভফুলের রসে রঞ্জিত সূক্ষ্ম বসন এখন সুন্দরীর নিতম্বে, কুঙ্কুম-রঞ্জিত রক্ত বসন রমণীর বক্ষে। কর্ণিকার- ফুল তাদের কর্ণশোভা, অশোক এবং নবমল্লিকা কুণ্ডলের শোভা। তাদের বক্ষে শ্বেতচন্দনের হার, হাতে অঙ্গদ ও বলয়, নিতম্বে চন্দ্র– হার, মুখে পত্রাবলি –তার মধ্যে স্বেতবিন্দু। কামের আকুলতায় কামিনীর অঙ্গ লাবণ্যময়, ক্ষীণ এবং অলস,

মুখ পাণ্ডুর, বসন শিথিল, শ্বাসপ্রবাহ দ্রুত। তাদের নয়ন মদিরাবিভোর ও চঞ্চল, কপোল পাণ্ডুর, ভ্রুকুটি কুটিল এবং বাক্য স্খলিত। তাদের বসন লাক্ষারসে রঞ্জিত এবং অগুরুচন্দনে সুবাসিত; প্রেমাস্পদের সঙ্গকামনায় তাদের উদ্বেগের অবধি নেই। স্ত্রীর বিচ্ছেদ– বেদনায় প্রবাসী পথিকের হৃদয়ে ক্রন্দনের হাহাকার। নিসর্গপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির ওতপ্রোত সমন্বয়ে শরতের অনিন্দ্যসুন্দর রূপটি অঙ্কিত করা হয়েছে ।

কালিদাসের এই ঋতুবর্ণনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য- মানুষ এবং প্রকৃতি তাঁর বর্ণনার চিত্রপটে একই সত্তা নিয়ে আবির্ভূত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির বর্ণনা তিনি দেননি। প্রকৃতি এবং মানুষ তাঁর কাব্যে একে অপরের পরিপূরক। মানব মনের অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করেই তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করেছেন, প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধময় অবয়বের অন্তরালে তিনি মানবমনের স্পন্দন উন্মোচন করেছেন। কালিদাসের ঋতুবর্ণনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির কোমল রূপের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনায় কবির অক্ষমতা আছে তা নয়, তবে প্রকৃতির রৌদ্র-ভয়াল রূপটি তাঁর কাব্যে প্রধান হয়ে ওঠেনি। ঋতুসংহারের প্রকৃতি নারী-অঙ্গের কোমলতায় বিভূষিত, নারীমনের মিলন- বিরহের আবেগব্যাকুলতায় মর্মরিত। কালিদাসের ঋতুবর্ণনার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর সৌন্দর্য্য-সন্ধানের সামগ্রিকতা এবং সূক্ষ্মতা। নারী-অঙ্গের বর্ণনার মধ্যে তাঁর শালীনতা ও পরিমিতবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নিসর্গপ্রকৃতি এবং নারীপ্রকৃতির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে তিনি তিল তিল করে সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করেছেন। ঋতুসংহার মহাকবির প্রকৃতিচিত্রণের তিলোত্তমা।[২]

সহায়কগ্রন্থ :

১। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, পৃষ্ঠা–৩১ও৩৯।

২। সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩০৯-৩১৪।

রুদ্র-সাহিত্যে আঞ্চলিকতা ও স্বকীয় বানান রীতি

মনোজকান্তি বিশ্বাস
প্রভাষক বাংলা বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

আঞ্চলিকতা : জন্মাঞ্চল ও জন্মমাটির গন্ধ মিশে থাকে কবি সাহিত্যিকের সৃজিত সাহিত্যে। সফলতা নির্ভর করে লেখকের শৈল্পিক ভাবনা, পরিমিতিবোধ, মার্জিত অথচ রুচিশীল ব্যক্তিত্বের উপর। বাংলা সাহিত্যে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬--১৯৯১)পাঠক প্রিয় এবং সমধিক জনপ্রিয় কবি। ব্যক্তি জীবনের মতো সাহিত্য জগতেও ছিলেন আপোষহীন। রুদ্রের অসংখ্য কবিতা, গান ও গদ্য সাহিত্যে আঞ্চলিক শব্দের প্রাচুর্যের সম্মিলন ঘটেছে। তাঁর আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগে জড়তা নেই, বরং খুব সাবলিল প্রয়োগের ফলে সাহিত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে মানুষের মানচিত্র কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায়। রুদ্র যে দশটির মতো ছোটগল্প লিখেছেন সেখানেও পুরানো ঢাকা এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বিশেষ করে সুন্দরবন সংলগ্ন মানুষের মুখে ব্যবহৃত ভাষা ছাড়াও দেশ বিদেশের অনেক আঞ্চলিক এবং পারিভাষিক শব্দের সার্থক প্রয়োগে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। রুদ্রের জনপ্রিয় গানগুলোর সুরের জালও বিস্তার করে আছে এমন কিছু আঞ্চলিক শব্দ। প্রতিটি শব্দ যেন বন্দুকের সাথে বারুদের তাক লাগানো স্ফুলিঙ্গ। একেবারেই পাঠকের-শ্রোতার অন্তরে গিয়ে আঘাত করেছে। শব্দগুলি যেখানে স্থাপন করেছেন সেখানেই শব্দ ঢাল হয়ে উঠেছে ভিন্ন মাত্রায়। যে ভাষায় নিজে কথা বলেছেন, সে ভাষাকে পাঠকের কাছে সহজ হৃদয়াঙ্গম করতে সহজ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান প্রয়োগ করেছেন। কিছু দৃষ্টান্ত এ ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে, যা রুদ্রের পাঠক সমাজ ও বাক্ শিল্পীদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় কবিতা থেকে কিছু সর্বজনবোধ্য সুখপাঠ্য আঞ্চলিক শব্দের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো–

> "পাখির নাহান ডাকো। মাঝরাতে ডাক দাও পাখির গলায়
> আমি কি বুঝি না ভাবো? কাতলা মাছের মতো ঘাই মারে বুকে,
> ওই ডাক ঘাই মারে রক্তে-মাংশে। ভাবো ঘরে আছি সুখে।
> আহারে পোড়ার সুখ- তুফানের গাঙ দেখে মাঝি সে পালায়।
> বুড়ো ভাতারের ঘর কোন সুখে করি তুমি বোঝো না নাগর?
> পাখির নাহান শুধু ডাক পাড়ো মাঝরাতে ঘরের কিনারে

হাঁপানির চোট খুব গরম তেলের জাব দিতে হয় তারে,
আমার হাঁপানি থাকে বুকের তুষের নিচে অনল-সাগর। " [কবিতাংশ- মানুষের মানচিত্র ২]

এখানে, ঘাই মারে (আঘাত করে), বুড়ো ভাতার (বুড়ো বর /বুড়ো স্বামী), গরম তেলের জাব (গরম তেল মালিস করা), হাঁপানির চোট (হাঁপানির কষ্ট), নাহান (মতো), পোড়ার সুখ (কষ্টের মধ্যে থেকেও ভালো থাকার চেষ্টা) এসব আঞ্চলিক শব্দগুলো বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। কবিতার বহু জায়গায় এসব শব্দ কবি নির্দিধায় ব্যবহার করেছেন।

"ভাসান যে দিতে চাও, কোন দেশে যাবা?
যাবা সে কোন বন্দরে আমারে একেলা থুয়ে?
এই ঘর যৈবনের কে দেবে পাহারা?
এমন কদম ফুল- ফোটা-ফুল থুয়ে কেউ পরবাসে যায়!
তুমি কেন যেতে চাও বুঝি সব, তবু এই পরান মানে না
লোকে কয় ভিন দেশে মেয়ে মানুষেরা নাকি বেজায় বেহায়া,
শরীরের মন্ত্র দিয়ে আটকায় শাদা-সিদে পুরুষ মানুষ।
তোমারে না হারাই যেন সেই দিব্যি দিয়ে যাও জলের কসম,
আর বলি মাস মাস খোরাকি পাঠাতে যেন হয় নাকো দেরি।" [কবিতাংশ-মানুষের মানচিত্র ৪]

উল্লেখিত কবিতাংশে-ভাসান (নৌকা ভাসানো/নৌকায় যাত্রা করা), থুয়ে (রেখে), যৈবনের (যৌবনের), পরাণ (প্রাণ), বেজায় বেহায়া (বড় লজ্জাহীন), শাদা-সিদে (সহজ-সরল), কসম (কিরা/শপথ করা), দিব্যি (অঙ্গীকার), খোরাকি (খাবার/আহার) এসব শব্দগুলো আমাদের চিরচেনা হলেও কবিতায় প্রয়োগে তা নতুন মাত্রা পেয়েছে।

"কি সুখে ছিলাম বউ! ভাত মাছ, তরকারি কিসের অভাব?
অতিত্তি বাড়িতে এসে খালি মুখে ফিরে যাবে সে কেমন কথা!
আর কি সেদিন আছে-কতো রাজা বদলায়, দিন তো ফেরে না।
কিছুই মেলে না আর, কেতাবের কলিকাল এরে বুঝি কয়? " [কবিতাংশ- মানুষের মানচিত্র ৬]

এখানে, অতিত্তি(অতিথি), খালিমুখে (কিছু মুখে না দেওয়া), কেতাবের কলিকাল (কলিযুগের পুস্তক অনুসরণ), এরে (একে) এ সকল শব্দ উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করে স্বঘোষিত শব্দ শ্রমিক কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ দক্ষ শব্দ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন।

"কুটুম এসেছে ঘরে, সাঁচিপান সাজো বউ রুপোর বাটায়।
চিরে মুড়ি আছে কিছু? নয়তো বাতাসা দাও সাথে নারকেল।
একেবারে খালি মুখ, আর কি সেদিন আছে, আহারে আকাল!
বানের নাহান ভেসে গেছে সব-হায়রে সুদিন।" [কবিতাংশ- মানুষের মানচিত্র ৬]

কুটুম (আত্মীয়), খালি (শূন্য), সাঁচিপান (সুগন্ধপান/সুন্দর করে মসলা মাখা সাজানো পান), চিরে (ফেড়ে), বানের নাহান (জলোচ্ছ্বাসের মতো), আকাল (অসময়ে / দুঃসময়ে), শব্দগুলো আধুনিক উপকরণে সমৃদ্ধ হলেও এ শব্দগুলো খেটে খাওয়া গ্রাম্য মানুষের ভাষা চিত্র।

"চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়- বিচ্ছেদ নয়
চলে যাওয়া মানে নয় বন্ধন ছিন্ন-করা আর্দ্র রজনী চলে গেলে
আমারও অধিক কিছু থেকে যাবে আমার না-থাকা জুড়ে।"...

.....

"চরম সত্যের কাছে নত হতে হয় সবাইকে-জীবন সুন্দর
আকাশ-বাতাস পাহাড়-সমুদ্র সবুজ বনানী ঘেরা প্রকৃতি সুন্দর
আর সবচেয়ে সুন্দর এই বেঁচে থাকা তবুও কি আজীবন বেঁচে থাকা যায়!

.....

দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যেতে হয় সবাইকে অজানা গন্তব্যে
হঠাৎ ডেকে ওঠে নাম না জানা পাখি অজান্তেই চমকে ওঠি
জীবন, ফুরালো নাকি!" [কবিতাংশ- চলে যাওয়া মানে প্রস্তান নয়]

কবিতাংশে লক্ষণীয় শব্দ সেহনাই (বিয়ের বাদ্য সানাই), পালকি (বাহন/ আগের দিনে কনেকে পালিকিতে করে শ্বশুর বাড়িতে নেয়া হতো), শিথান (শিয়র / শিরস্থান) এমন অজস্র শব্দের ঝনঝনানি কবিতার ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে। মানব জীবনের চরম সত্যকে ঠাঁই দিয়েছেন সহজিয়া এসব শব্দের রুপালি ঝলকানিতে রুদ্র অমলিন থাকবেন এবং অমরত্ব লাভ করবেন।

"রাতের আঁধারে খুঁজে তারে তুই পাবি?
চৌকিদার, পাবি তারে? যে-চোর পাহারা দেয়,
পাহারার নামে করে ভয়ানক চুরি,
চুরি করে মানুষের ঘিলু-মাংস-রক্ত-হাড় বুকের বাসনা,
তারে পাবি, যে-তোর জীবন থেকে চুরি করে পূর্নিমার রাত" [মানুষের মানচিত্র -৭]

ঘিলু (মগজ), গতর (শরীর, উদ্ধৃতাংশ ছাড়াও কবিতার শরীর জুড়ে, সিঁধেল চোর (ছোট খাটো চুরি করে যারা) ছিচকে (যারা সিধ কেটে চুরি করে), খোয়াব (স্বপ্ন), পাটের পচনের (পাট পচানো বা জাগ দেওয়ার) মত এ রকম অসংখ্য শব্দ রাজি রয়েছে।

"ডাঙায় ডাঙর হয় গভীর ফাটল আর জলে বাড়ে নোনা।
এই তো আমার ঘর, রোদে জ্বলা, জলে ভেজা আমার বসতি,
এই তো আমার দেশ, এই তো আমার প্রেম, আমার হৃদয়-
তিন ভাগ জলের উপর ভাষা এক ভাগ মানবিক মাটি।" [মানুষের মানচিত্র-৭]

এক্ষেত্রে-নোনা (নুন যুক্ত/লবনাক্ত), ডাঙায় (স্থল ভাগে), ডাগর (হৃষ্টপুষ্ট/বড়সড়ো), মানবিক মাটি (মানবীয় গুন সম্পন্ন মাটি) এ শব্দগুলো মাটির গন্ধে ভরপুর।

"শিঙেল বয়ারগুলো সারাদিন জলে ডুবে ঝাপটায় মাথা।
দু-চারিটি ধোড়াসাপ ভয়ে ভয়ে ঘোরে ফেরে খালের কিনারে।
মাছ খায়। পাড়ে কিছু গোড়াই মল্লিক আর খয়েরি শালিক–
ভাবো তো এমন দৃশ্য কবে তুমি দেখেছিলে, কতোকাল আগে?
গোরুর বাথালে এক শ্যামলা রাখাল তার কী সুরেলা বাঁশি
মনে পড়ে রোদের পাহারা-ঘেরা দূর এক বিরান প্রান্তরে
সেই বাঁকা ঝাউগাছ, রাজা-প্রজাপতি আর ঝাঁক ঝাঁক টিয়ে?
মহুয়ার পালা শুনে কী যে কষ্ট বুকে নিয়ে ফেরা-মনে পড়ে?" [মানুষের মানচিত্র-৮]

এখানে শিঙেল (শিংযুক্ত), ঢোঁড়াসাপ (একধরনের সাপ), গোরুর বাথালে গরুর (গরুর গোয়ালে/গরুর থাকার ঘর), শ্যামলা (পুরোপুরি কালো নয়), টিয়ে (টিয়া পাখি), রাজা প্রজাপতি (প্রজাপতি সর্দার), শব্দগুলো কবির অনন্য সংযোজন।

"সোমত্ত জোয়ার ঘাড় ফেরায়ে বলেছে মেয়ে-যাবো না, যাবো না।
ভরা অভাবের মাসে এখন কোথায় যাবো, কে দেবে খোরাকি?
যে অঙ্গ সোহাগ চায় সেইখানে লাথি নিয়ে নেমেছে একাকী।
অন্ধকারে। নামতে হয়েছে তাকে, তার কথা হয় নাই শোনা।
সোয়ামির ঘর থেকে তালাক হয়েছে তার,
জোটেনি তালাক জীবনের কাছ থেকে।
জীবন নিয়েছে তারে অন্ধকারে টেনে।
মজা পুকুরের পাড়ে ভিন পুরুষেরা তার দেহখানা
ছেনে চিনিয়ে দিয়েছে দেহ, জীবনের কানাগলি, অন্ধকার বাঁক।" [মানুষের মানচিত্র- ১০]

এছাড়া সোমত্ত (বয়ঃপ্রাপ্ত / যৌবনপ্রাপ্ত), জোয়ার (যুবা/যুবতী), খোরাকি (আহার্য), সোয়ামির (স্বামীর), উদ্ধৃতি বাদেও কবিতার মধ্যে মাগি (খারাপ স্ত্রী লোক) শব্দের মত আরও অনেক শব্দ রয়েছে।

"ওলো ও বেদেনি শোন, ছোবল দিয়েছে বুকে জাত কালসাপ,
নীলবর্ন হয়ে আসে সোনার গতরখানা অঙ্গ জ্বলে বিষে,
কী সাপে দংশিলো লখা? ঘোরবর্ণ সাপ ছিলো অন্ধকারে মিশে।
উদোম নাচন দিয়ে দুই কানে শোনা তুই মন্ত্রের আলাপ।
কী সাপে দংশিলো লখা! জীবন আন্ধার হলো,
অঙ্গ হলো কালি, এ-কোন সাপের বিষ

জীবন নেয় না শুধু শরীর জ্বালায়,
পরান পোড়ায় নামে বিষের নহর যেন রক্তের নালায়–
দোহাই বেদেনি তোর, বিষের বাগানে তুই বিষহরা মালি" [মানুষেরমানচিত্র-১৩]

গতর (শরীর),ওলো (ওহে), বেদেনি (বেদের স্ত্রী), বিষের নহর (বিষের নদী), পরান পোড়ায় (প্রাণ আনচান করে), আন্ধার (অন্ধকার), দোহাই বেদেনি (বেদেনিকে দিব্যি দেওয়া) উদোম (উদ্দাম), নাচন (নৃত্য)।

"গাঁয়ের হালোট বেয়ে গরুগুলো ঘোরে ফেরে। হাটবারে আসে।
জাংলা থেকে শিম পাড়ে ঘরের নোতুন বউ, মন উচাটন।
খেয়াঘাটে লোক জমে। ওপাড়ায় চুরি হয়।
থামে না জীবন- গাঙের উজান স্রোত
চিরকাল যেন এক কালো নৌকো ভাসে।" [মানুষের মানচিত্র-১৭]

হালোট (কাদা), হাটবারে (হাটের দিন বা যে বারে হাট বসে), জংলা (ঝোপঝাড়) গাঙের (নদীর) উচাটন (চঞ্চল) এরকম অসংখ্য শব্দ খেলা করে বাচিকের স্বর ক্ষেপণে।

"মলিন আজান শুনে জেগে ওঠে পোলাটার ভাতারখাগি মা,
শরীর সয় না আর, ভরা অভাবের মাস এখন কার্তিক।
সবার হাড়িতে টান। সাত গ্রাম ঘুরে তবু মেলে নাকো ভিখ-
ক্ষীণকণ্ঠ মুয়াজ্জিন, দুবেলা জোটে না তারো।অভাবের সীমা।" [মানুষের মানচিত্র-১৯]

লক্ষনীয় শব্দ- ভাতার খাগি মা, (ভাত খায় যে/স্বামীর ভাত খায় যে স্ত্রী), হাড়িতে টান (অভাবী), ভিখ (ভিক্ষা)। ন্যুব্জ (বয়সের ভারে বাকা বা কুজো), আন্ধার (অন্ধকার), সলোক (আলোক), খুপড়ি (ভাঙাচোরা), চোট (আঘাত), টাটায় (হিংসায়)। শিথানে (মাথার কাছে/শিয়রের কাছে) এ সকল আঞ্চলিক শব্দ কবিতাতেই বেশি লক্ষ্য করা যায়।

গল্পে : রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ দশটি ছোটগল্প লিখেছেন। কবির শেষের দিকের বেশ কিছু কবিতায় ও ছোটগল্পের স্বাদ পাওয়া যায়। বলা যায় অকাল মৃত্যুর আগে গল্প লেখা শুরু করেছিলেন মাত্র। তার মধ্যেও কয়েকটা গল্পে আঞ্চলিক শব্দের চমৎকার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে 'সোনালি শিশির', 'শিরোনামহীন' এবং "উপন্যাসের খসড়া" গল্পে চমৎকার আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে তিনি পৌঁছে গেছেন পাঠকের হৃদয় দোরগোড়ায়। উপন্যাসের খসড়া গল্পের একপর্যায় লিখেছেন, "মোফিজোদ্দি, কাজডা কলাম ভালো কত্তিছো না। গিরামের ছ্যামড়াগুলোরে যে আমার বিরুদ্ধে লাগাইছো। এ্যাহন যদি ওগের কাছ থে আমার জমি জোমা ছাড়ায়ে নি, সব তো না খাইয়ে মরবে।খাতি দিবা তুমি?..... নয়া নয়া পয়সা হইছে, আন্দাজ পাচ্ছ না কিছু? লেহাপড়া কত্তিছো তাই করো। লোকে ভালো কবে। বুঝিছ?" গল্পটির মধ্যে এ রকম কিছু নির্ভেজাল আঞ্চলিক শব্দ রয়েছে।

সোনালি শিশির গল্পের মধ্যেও রয়েছে ও রকম কিছু শব্দে যোজনা। গল্পের এক পর্যায়ে লিখছেন, ইসহাকও জবান খুলে দেয়, "মদ না তুই মুত খা--কতা কম। চোপা খুইলা হাতে ধরায়া দিমু। হালার খবিশ। মুখ খারাপ করবিতো খোমা পাল্টায়া ফালাবো চুতমারানি।" সমাজ বাস্তবতার চিত্রের সাথে পাঠককে নির্মল বিনোদন দেওয়ার জন্যই এমন আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ করেছেন বলে ধারনা। শিরোনামহীন গল্পের মধ্যেও মাঝেমধ্যে দু'একটি আঞ্চলিক শব্দ আছে, যেমন শালার বাঙালি, আমারা শালা, বোকাচোদা, চরকি ইত্যাদি। বাকিগল্পে ছিটেফোঁটা আঞ্চলিক শব্দ থাকলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়।

গান : রুদ্রের নিজ হাতে গড়া সংগঠন 'অন্তর বাজাও' দল নিয়ে যাচ্ছিলেন খুলনার হাদিস পার্কের অনুষ্ঠানে গান গাইতে। মোংলা-খুলনার বাস কন্ট্রাক্টর বারংবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল গাড়ি সরাসরি খুলনা যাবে। গাড়িতে উঠেই রুদ্রেরা বুঝতে পারলেন ধারনা ভুল। গাড়ি লোকাল হয়ে গেছে,জায়গায় জায়গায় থামছে। ব্যস, তৎক্ষণাৎ গান বেঁধে ফেললেন রুদ্র–

"এ কি খেলা দেখাইলি, টাকা বারোটা নিলি,
ডাইরেক্ট কইয়া আইসা আবার, লোকাল বানাইলি।"

এ গানের শব্দ একান্তই রুদ্রের। এখানে লোকাল শব্দটিও আঞ্চলিক এর পরিভাষা। এছাড়া বারোটা, নিলি, কইয়া, আইসা,বানাইলি এ শব্দগুলো পুরো আঞ্চলিক ভাষা এবং আমাদের আবেগ প্রকাশক প্রাণের ভাষা। কিছু শব্দ আছে ভিন্ন ভাষা থেকে নেওয়া তবে এগুলো এখন সামান্য বিকৃত করে আঞ্চলিক শব্দেও স্থান পেয়েছে। যেমন, 'Direct' ইংরেজি শব্দ হলেও গ্রাম্য সহজিয়া ভাষায় মানুষ ডাইরেক্টো, ডইরেক্ট, ডিরেক্ট এভাবেও ব্যবহার করছেন।

গান জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম কারন সর্বজনীন ভাষা ব্যবহার এবং যথার্থ প্রয়োগ। গানে ব্যবহৃত শব্দ এবং উপমাগুলো গ্রাম, গঞ্জ, শহরের মানুষের মিশ্র জনবোধ্য ভাষা। যেমন সাবলীল তেমনি তা সহজে মানুষের অন্তরে তরঙ্গ তোলে। তাঁর বিখ্যাত কিছু গানের মধ্যে এমন দারুণ সব শব্দের সমাহার, এগুলোকে না বলা যায় পুরোপুরি আঞ্চলিক না পুরো আধুনিক। আবার আধুনিক শব্দেরও ব্যবহার রয়েছে প্রচুর। আঞ্চলিক শব্দ খুঁজতে গিয়ে কিছু সর্বজনীন শব্দের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় -যেমন, পৌষের রাত, ঝিনুক, আবডালে, ফসলের, খোলস, মুক্তোর সুখ, নিবিড়, মালাখান ছিঁড়িতে, দড়াদড়ি, ফুসমন্তরে, খুন্তি নাড়ানাড়ি, ছিনিমিনি, জলেরধ্বনি, সোহাগে, শিকড়েরা, জলেরধ্বনি, দিনগ্যালো, থামাথামি, তেমাথা, দালানকোঠা, রঙ্গরস, আঙ্গ, আঙিনা। ভাঙাচোরামন, জীবনডারে, শরীরবেচে, মাইনে, থুই, পড়শি, ভদ্রলোক, জাপটে ধরেছে, ভাঙাব্রীজ ইত্যাদি শব্দগুলো রুদ্রের জনপ্রিয় গানগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় এসব শব্দ দেশের দুর্বোধ্য আঞ্চলিক নয়। বিশেষ করে চট্টগ্রাম, নোয়াখালির আঞ্চলিক শব্দ অন্য অঞ্চলের লোকের পক্ষে বুঝেওঠা সত্যিই দুরুহ। এ রকম কোনো শব্দ তিনি সাহিত্যে

ব্যবহার করেননি যা মানুষের কাছে দুর্বোধ্য, এবং পাঠকের কাছে অপরিচিত। সতত স্রোতস্বীনির মতো রুদ্রের কলমে এ সকল শব্দ এসেছে নির্ঝরিণীর মতো। এখানেই কবির বিশেষত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য ।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র বাড়িতে এবং সমাধিতে তাঁর নিজ হাতে গড়া 'অন্তর বাজাও' শিল্পীগোষ্ঠির শিল্পীবৃন্দের সাথে রুদ্রের ছোট ভাই হিমেল বরকত, লেখক মনোজ কান্তি বিশ্বাস, লেখক ও অধ্যাপক বিভূতি ভূষণ মণ্ডল ও লেখক নীল রতন মণ্ডল।

রুদ্রের স্বকীয় বানান রীতি :

'দিন আসবেই দিন আসবেই দিন সমতার'

রুদ্রের এই স্বপ্ন-বিশ্বাসের ফল প্রতিফলিত হচ্ছে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে না হলেও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রুদ্র বিশ্বাস, রুদ্র চিন্তা, রুদ্র দর্শণ প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। রুদ্রের বানান চিন্তন ও দক্ষতা তঁর সময় প্রতিফলিত না হলেও বর্তমান পাঠকের কাছে দারুণভাবে সমাদ্রিত। বস্তুত রুদ্রের অনুসৃত বানান রীতি অনুসরণ দিন দিন মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। তিনি বানানকে সময়োপযোগী ও ভাষার ব্যবহার সার্বজনীন করতে চেয়েছিলেন। রুদ্রের সমকালে মাঝে মধ্যেই কবিকে বানান নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেকের অভিযোগ ছিলো রুদ্র বাংলা একাডেমি প্রণীত অভিধানের প্রমিত বাংলা বানান অনুসরণ করছেন না। কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন,কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, রুদ্রের সহপাঠী কামাল হোসেন, আলি রিয়াজ, জাফর ওয়াজেদ এবং কবি অসীম সাহা সহ অনেকের সাথে বানান নিয়ে বিভিন্নভাবে কথা বলেছেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। কিন্তু রুদ্র নিজের যুক্তিতে এবং নিজের জায়গায় অবিচল ছিলেন। তিনি মানুষের সহজ উচ্চারণকে বানান রীতিতে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্যে বানান ব্যবহার সহজ করার পক্ষে ছিলেন সব সময়।

সবেমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, তাঁর আলাপের ভঙ্গিতে মুন্সিয়ানা পুরোপুরি। কবি নূরুল

হুদাকে বললেন, "ছোটগল্প ও কবিতার বিভেদ ঘুঁচিয়ে আমি এক ধরনের নতুন রচনা উপহার দিতে চাই,যা সহজে পাঠক-শ্রোতার কাছে পৌঁছবে। আধুনিক কবিতার তথাকথিত দুর্বোধ্যতা হটিয়ে আমি কবিতাকে লোকপ্রিয় করতে চাই। পুরানো বানান ফানান বদলে উচ্চারণমাফিক সহজ বানানরীতি চাই।"

তিনি আশা করতেন বাংলা একাডেমি এক সময় তাঁর বানানরীতিকে অনুসরণ করবে। রুদ্রের অনুসৃত বানান রীতির বিশেষ কিছু দিক আলোকপাত করা হলো।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তারা জানেন-নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কবি গড়ে নিয়েছিলেন নিজস্ব বানানরীতি। বাংলা ভাষায় মূর্ধন্য 'ণ'-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ না-তজাকায়,বাংলা বানানে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর সমস্ত রচনা থেকে নির্বাসিত হয়েছে 'ণ'। পাঠের সুবিধার্থে কিছু কিছু দ্বি-অক্ষরবিশিষ্ট সমাপিকা ক্রিয়ায় তিনি 'ও' কার [বোলে, কোরে, বোসে, বুড়ো] এবং বাকি অসমাপিকা ক্রিয়ায় লোপ চিহ্ন (') ব্যবহার করেছেন। আবার, উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়ে এবং বানান সহজতর করার লক্ষ্যে অনেক শব্দেই দীর্ঘ 'ঈ' কার ওদীর্ঘ 'ঊ'কার এর পরিবর্তে হ্রস্ব 'ই' কার ও হ্রস্ব 'উ' কার গ্রহণ করেছেন। তিনি বর্জন করেছেন অনুচ্চারিত 'য'-ফলা [সন্ধা, জোস্না, বন্ধা], কোথাও বা শব্দের-মধ্যের বিসর্গ 'ঃ' [নিসঙ্গ, নিশব্দ, অতপর]; কোনো শব্দে 'ঙ'-এর বদলে অনুস্বার 'ং' এবং 'স'-এর পরিবর্তে তালব্য 'শ' ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও রুদ্রের কিছু বানান প্রচলিত অভিধান সমর্থিত নয়। শব্দের উচ্চারণ, ভাষা ব্যবহার ক্রমাগত সহজতর করার প্রবণতা থেকে রুদ্রের গবেষণালব্দ এ রীতি ভবিষ্যতে বাংলায় গৃহীত হতে পারে বলেও অনেকের ধারনা। যুগের সাথে তাল মেলাতে গেলে বাংলা লিপিতে বিভিন্ন ফন্টের ব্যবহারের ক্ষেত্রে রুদ্রের বানানরীতিই আমাদের সহজপথ বাতলে দিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

রুদ্রের কবিতা, গান, গল্প ও গদ্যে তথা সমগ্র রচনায় উক্ত বানানরীতি লক্ষ্য করা যায়। তার কিছু উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়...

"ঝর্নার মতো তারা নেমে যেতে চায়
কিছু মাটির শরীরে–
আমি সেই নতমুখ, পাথরের নিচের করুন বেদনার জল,
আমি সেই অভিমান– আমাকে গ্রহন করো।" [ঝর্না, করুন, গ্রহণ– কবিতাংশ-আমি সেই অভিমান]
"অভিলাষী মন চন্দ্রে না -পাক জোস্নায় পাক সামান্য ঠাঁই.....
আরো কিছুদিন, আরো কিছুদিন -আর কতদিন?
ভাষাহীন তরু বিশ্বাসী ছায়া কতোটা বিলাবে।"

(জোস্নায়, আরো, কতোটা-কবিতাংশ-অভিমানের খেয়া) এরকম অন্য ক্ষেত্রেও বোঝোনা, করোনা, ধরোনা ব্যবহৃত হয়েছে।

"মেম্বারের ছেলে দুটো ইশকুলে পড়ে আমার হাড়িতে টান।"

[ইশকুল, (স্কুল), ধ'রে ফ্যালে, ঘোরবর্ণ, বোলে, কোরে, শাদা (সাদা) বানানটিও অন্যরূপ ব্যবহার করেছেন।] (কবিতাংশ-মানুষের মানচিত্র–৩)

"চরম সত্যের কাছে নত হতে হয় সবাইকে–
জীবন সুন্দর আকাশ-বাতাস পাহাড়-সমুদ্র
সবুজ বনানী ঘেরা প্রকৃতি সুন্দর
... ...
এই যে বেঁচে ছিলাম
দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যেতে হয় সবাইকে
অজানা গন্তব্যে হঠাৎ ডেকে ওঠে নাম না জানা পাখি
অজান্তেই চমকে ওঠি জীবন, ফুরালো নাকি।" [কবিতাংশ- চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়]

রুদ্রের সমগ্র রচনার শরীর জুড়ে রয়েছে তারঁ নিজস্ব এসব বানানের ছড়াছড়ি। সাহিত্যের ভূবনে নিজস্ব বানান ব্যবহারে নতুন ভূবন সৃষ্টি করেছেন। যা তাঁর একান্তই নিজস্ব। অনুসন্ধিৎসু বাঙালির কাছে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সৃষ্টিশীল ভূবন নির্মাণের আশার বাতিঘর। গদ্য-পদ্য মিলিয়ে পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে লিখেছেন সুপ্রচুর। এ রকম শিল্পিত উচ্চারণ, শব্দ প্রয়োগ, অলংকার ব্যবহার, বাক্যবিন্যাস, শ্রবণসুভগ ধ্বনিবিন্যাস এবং স্বকণ্ঠে আবৃত্তি সচারচার অন্য কারো ক্ষেত্রে চোখে পড়েনা।

তথ্য ঋণ :

১। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাবলী ১ ও ২, সম্পাদনা হিমেল বরকত-মাওলাব্রাদার্স-জুন-২০০৭ খ্রি.।
২। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা-হিমেল বরকত, অক্ষর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি -২০১৫ খ্রি.।
৩। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (জীবনীগ্রন্থ), তপন বাগচী,বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৮খ্রি.

আজও প্রাসঙ্গিক আজও আধুনিক অসাম্প্রদায়িক নজরুল

রূপা দাস
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন "একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আলোচনা হচ্ছিলো হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন 'দেখ, যে ল্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ল্যাজকে কাটবে কে?"- প্রকৃতপক্ষে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভাজন, যা উভয় সম্প্রদায়ের মর্মমূলে গ্রথিত হয়ে আছে- নজরুলের সময়ে এটি ছিল অন্যতম প্রধান সমাজিক সমস্যা। অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তবুদ্ধির পূজারি কাজী নজরুল ইসলাম সমাজের এই দুঃসময়ে হিন্দু মুসলিম ঐতিহ্যের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সার্থক সংমিশ্রন ঘটেছে তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে। এই সুবাদে উভয় শ্রেণির 'গোঁড়া' অংশটি তাঁকে 'শয়তানের পূর্ণাবতার' বলতে ও দ্বিধা করেনি। কিন্তু নির্ভীক নজরুল জানিয়েছেন, " ....হিন্দু মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ........ এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম।"

নজরুল গণমানুষের কবি। আপামর জনগণকে তিনি হিড়হিড় করে টেনে আনলেন সাহিত্যের উদোম জলসায়। গেরুয়া বসন, বাউরী- কাহারদের মত ঝাঁকড়া চুল, রাঢ়ের টানা রঙ আর মজবুত কাঠামো- 'বাঘা ' গলায় আদিগন্ত মনুষ্যকুলকে তোলপাড় করে দেবার মত সম্মোহনী যৌবন নজরুলের। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলনে লড়াই- আর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা উভয় অনুপ্রেরণা একাকার হয়ে যায় নজরুলের লেখনীতে। রবীন্দ্রসাহিত্যের জমজমাট রাজত্বের মধ্যে বাহারী ফণা খেলিয়ে লিখলেন 'অগ্নিবীণা, 'বিষের বাঁশী। বিখ্যাত কবিতা- বিদ্রোহী।

গদ্য- বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী, পত্রিকা- ধুমকেতু। কবিতার দায়ে গেলেন জেলে । সেখানে বসে লিখলেন 'শিকল ভাঙার গান'। আদালতে বিবৃতি দিলেন 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'। তার নিজস্ব শব্দ-ভঙ্গি, উচ্চারণ, স্বাদ, অকৃত্রিমতা একেবারে ঝুরঝুরে মাটিসুদ্ধ শেকড় বাকড় সমেত শিক্ষিত নাগরিক কবিতায় রোপণ করে দিলেন তিনি। আজ এই একবিংশ শতাব্দীর প্রগতির বুকে দাঁড়িয়ে নজরুলের বোধকে লালন করা- প্রায় দুঃসাধ্য।

পাঠ্য ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ অর্থাৎ কমিউনিকেশন একটা জরুরি ব্যাপার। নজরুল এখানে সম্পূর্ণ সফল। তাঁর দরাজ গলার ঘা-দেওয়া ভাষা দিয়ে মাঠের মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে

রাখতেন। জন্মসূত্রে মুসলমান নজরুল পারিবারিক ও ধর্ম বিশ্বাসের সূত্রে রক্তে ধারণ করেছেন মুসলিম ঐতিহ্যের বিপুল সম্ভার। আর পারিপার্শ্বিক থেকে অর্জন করেছিলেন হিন্দু ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে অনায়াস প্রবেশাধিকার। মক্তবে যে নজরুল মৌলবী সাহেবের কাছে আরবি-ফারসি শিখেছেন, সেই নজরুলই অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে পেয়েছেন ব্রাহ্মণ সন্তান শৈলজানন্দকে। নজরুল যে কতখানি উদারচেতা ছিলেন বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের অতি বিখ্যাত কবিতা 'রক্তাম্বর ধারিণী মা' ও 'আগমনী' দেবী দুর্গাকে অবলম্বন করে রচিত–

"শ্বেত শতদল- বাসিনী নয় আজ

রক্তাম্বর ধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।"

কিংবা

"আমি বসিব বলিয়া পেতেছে ভবানি ব্রহ্মার বুকে পিঁড়ি।"

মুসলিম ঐতিহ্য বা অনুষঙ্গ তার কবিতায় এসেছে রক্তের টানে। ইসলামী ঐতিহ্য অন্বেষণে নজরুলকে ভারতভূমি ত্যাগ করে আরবভূমির দিকে মুখ ফেরাতে হয়েছে। চার খলিফা ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এখানে তাঁর আদর্শ। কারবালার প্রান্তরের শোকাবহ ঘটনায় তাঁর অন্তর কেঁপে ওঠে। তিনি বলেন–

"মোহররম! কারবালা! কাঁদো 'হায় হোসেনা!'
দেখে মরু-সূর্যে এ খুন যেন শেষ না! (মোহররম)

ধনগর্বী ইউরোপের দাপটে ইসলাম বিপন্ন,'শাত-ইল-আরব' তখন রাজনৈকিত ইস্যু। তিনি বলেন–

"'জুলফিকার' আর 'হায়দরী' হাঁক হেথা আজো হযরত আলীর–
শাতিল্- আরব! শাতিল!! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে তিনি দু'টি কবিতা রচনা করেছেন 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' শিরোনামে 'বিষের বাঁশি কাব্যে।'

নজরুল তীব্রভাবে বিশ্বাস করতেন, 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'। আজ সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের এ কেজো ভূমিতে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি হয় আমরা সাম্প্রদায়িকতার শবকে এখনও ব্যবচ্ছেদ করতে পারিনি। একজন 'কামাল পাশা'-কিংবা' 'আনোয়ার' আবার ফিরে আসুক এই রঙ্গভরা বঙ্গে। নজরুলের 'রণভেরী' আজও বাজে প্রকৃত শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে।

"ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।"

দৃষ্টিভঙ্গি

প্রমীলা রায়
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

বোকা আর বুদ্ধিমানের ধারণা একেবারে বদলে গেল। সত্যিকারের বোকা কে, আর বুদ্ধিমানই বা কে! তা বলা আপেক্ষিক। ঘটনাস্থল বিশেষভাবে সক্ষম এক শিশুদের বিদ্যালয়। এক শীতের দুপুর বিদ্যালয়ে চলছে শিশুদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এক সময় শুরু হল দৌড় প্রতিযোগিতা। একটু দূর এগোতেই একটা শিশু নিজের পায়ে পা জড়িয়ে পড়ে গেল। সুস্থ স্বাভাবিক শিশুদের প্রতিযোগিতার আসরে এরকম দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। তখন বাকি প্রতিযোগীরা দৌড় চালিয়ে যায়। কিন্তু একি আশ্চর্য! এখানে ঘটলো বিপরীত ঘটনা। বাকি প্রতিযোগীরা যখন খেয়াল করল, তাদের এক সতীর্থ বন্ধু পড়ে গেছে, তখন তারা উল্টোদিকে ফিরে গেল, সেই পড়ে যাওয়া শিশুর কাছে। সতীর্থকে তুলে, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সুস্থ করে, আবার ফিরে গেল স্টারটিং লাইনে। আবারও শুরু হলো দৌড়, দেখা গেল পড়ে যাওয়া শিশুটিও দৌড়ে সামিল হয়েছে। আজকের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার বাজারে যখন দেখছি সহমর্মী বন্ধু কেউই নেই। সকলে সকলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাইছে বা সর্বোচ্চ স্থান দখলের জন্য উদগ্রীব, তখন ওই বিশেষভাবে সক্ষম ওই শিশুদের অনেকেই বোকা বলে মনে করবে। কিন্তু মনুষ্যত্বের বিচারে সত্যিই কি তাদেরকে বোকা বলা যায়? জীবনানন্দ দাশের "সুচেতনা" কবিতার পঙক্তি ধার করে বলতে ইচ্ছা করছে,

এই পৃথিবী রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সূচনা হলে মানুষের মধ্যে বিপুল এক আত্মিক শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে, আসে এক দুরন্ত প্রাণময়তা আর আত্মনিবেদনের গভীর প্রেরণা। যার অর্থ আকুলতার চেয়ে অনেক মহৎ এক স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যমের দীপ্ত প্রকাশ। যদি আমি নিজেকে একজন কর্মচারী মনে করি, তবে আমার কাজের ধারা হবে একরকম, আর যদি দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ পরিবর্তন ঘটে, তবে কাজের ধারাটাই সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। আমাদের সকলকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হতে হবে, তাহলে সমাজের পট পরিবর্তন সম্ভব। আমরা কাহিনীর শিশুদের মত মানবিক দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার চেষ্টা করি।

সুন্দরবনের পেশাজীবী সমম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা

ড. অসিত কুমার বসু
প্রভাষক, সংস্কৃত বিভাগ ও সম্পাদক, শিক্ষক পরিষদ, মোংলা সরকারি কলেজ

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ঘিরে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন অবস্থিত। অসংখ্য বৃক্ষ-গুল্ম সমাচ্ছাদিত সুন্দরবনের বিস্তৃতি পশ্চিমে ভাগীরথী নদীর মোহনা থেকে পূর্বে মেঘনা নদীর মোহনা পর্যন্ত। দেশ ভাগের পূর্বে বাখরগঞ্জ, খুলনা ও চব্বিশ পরগনা জেলার বিস্তৃত অঞ্চল সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই তিনটি জেলার যে অংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বত্বাধীন তার দক্ষিণভাগে সুন্দরবন অবস্থিত। দেশ ভাগ হওয়ার ফলে সুন্দরবনের একভাগ ভারতের অংশ অপরভাগ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[১] সুন্দরবনের সীমানা পশ্চিমবেঙ্গের দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হুগলী নদী থেকে রায়মঙ্গল নদী এবং বাংলাদেশের খুলনা জেলার রায়মঙ্গল থেকে মধুমতি নদী ও বাখরগঞ্জ অর্থাৎ বরিশাল জেলার মধুমতি থেকে মেঘনা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।[২] পূর্ব-পশ্চিমে এ বনভূমির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে গড় বিস্তৃতি প্রায় ৫০ মাইল।[৩] বস্তুত প্রায় ১০,০০০ বর্গ-কিলোমিটার আয়তন সমৃদ্ধ সুন্দরবনের প্রায় ৬,০০০ বর্গ-কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে।[৪] তন্মধ্যে খুলনা জেলার সুন্দরবনের আয়তন ৫,৩২৭ বর্গ-কিলোমিটার, মোটামুটিভাবে সুন্দরবন ৮৮°৫১′-৯১°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২১°৩′-২২°৩০′ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত।[৫]

সুন্দরবন নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানামতের সৃষ্টি হয়েছে। তবে অধিকাংশ মানুষের অভিমত হলো, সুন্দরীবৃক্ষের আধিক্যের কারণেই জঙ্গলটি সুন্দরবন নামে পরিচিত।[৬] অপরদিকে কারো কারো মতে চন্দ্রবন বা সমুদ্রবন বা সুন্ধা থেকে এসেছে সুন্দরবন।[৭] সুন্দরবন যে বাস্তবিকই অভিনব এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। দিগন্ত বিস্তৃত বিটপীশ্রেণী, মানব শরীরের শিরা-উপশিরার ন্যায় প্রবাহিত অসংখ্য নদ-নদী এবং অগণিত জীবজন্তু সুন্দরবনের সৌন্দর্যকে মহিমা দান করেছে। একদা যে ভূমি ছিল হিংস্র শ্বাপদসংকুল, সময়ের সাথে সাথে যুগের বিবর্তনে এখন তা মনুষ্যবাসের উপযোগী ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তাই প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে আজ তেমন কোন বিরোধ নেই বরং উভয়ের সহাবস্থানে সেখানে গড়ে উঠেছে জীবনের এক পরম উৎকর্ষের এক নতুন সংস্কৃতি। মা যেমন শিশুকে কোলে আগলে রাখে, সুন্দরবনও তেমনি আবেষ্টনীর দ্বারা রক্ষা করছে এর অধিবাসীদের বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের বৃহত্তম "ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট" হিসেবে সুন্দরবন বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৮]

সুন্দরবনে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী হচ্ছে পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, মুসলমান, খ্রিস্টান এবং স্বল্প সংখ্যক আদিবাসী সম্প্রদায়। তবে পৌন্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায় সুন্দরবনের আদি অধিবাসী। সুন্দরবনের ভাঙ্গা-গড়া, উত্থান-পতন, সমৃদ্ধি বিপর্যয়ের সাথে এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৯]

বৃহত্তর খুলনা বর্তমানে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণাংশের প্রান্তসীমা জুড়ে বিস্তৃত সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে বসবাসরত জনগোষ্ঠী আনুমানিক ছয় লক্ষ মানুষ জীবিকাসূত্রে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। সুন্দরবনের পেশাজীবী সম্প্রদায় ভুক্তদের মধ্যে প্রধানতঃ পাই বাওয়ালী, মৌয়ালী, চুনারু ও মৎসজীবীদের। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এসব পেশাজীবী সম্প্রদায় জঙ্গলে অবস্থান করে। মৎস্যজীবীরা অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস অর্থাৎ কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্যন্ত সুন্দরবন সংলগ্ন সমুদ্রতটে অবস্থান করে। শরণখোলা রেঞ্জের দুবলার ১৩ টি চর এ সময় জেলেরা অবস্থান করে। এই চরগুলির নাম- অফিসকিল্লা, মাঝের কিল্লা, মেহের আলী, আলোর কোল, শোলার চর, নারিকেলবাড়িয়ার চর, মানিক খালির চর, কবরখালির চর, বড় আমবাড়িয়ার চর, কোকিলমনির চর, হলদীখানির চর।[১০]

সুন্দরবনের বসবাসকারী এই চার শ্রেণির পেশাজীবী সম্প্রদায়ের জীবনও জীবিকার কথা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

বাওয়ালী : সুন্দরবনে বনজ সম্পদ যথা :- কাঠ, গোলপাতা সংগ্রহকারীকে সাধারণভাবে বাওয়ালী নামে বিবেচনা করা হলেও বাওয়ালী শব্দের নামের ব্যাপকতা রয়েছে। বাউলে, বাবলে প্রভৃতি শব্দগুলি বাওয়ালী শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু সুন্দরবনে বনজ সম্পদ যারা সংগ্রহ করে তাদেরকে নানা প্রকার ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে চলতে হয়। বাওয়ালী অর্থ সাধারণভাবে বনবাসীকে বুঝায়।[১১] সুন্দরবনে কাঠুরিয়াদের ও প্রধানত বাওয়ালী বলা হয়। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার লোকেরা সবচেয়ে বেশি বাওয়ালীর কাজ করে। সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর মধ্যে বদ্ধমূল বিশ্বাস রয়েছে যে বাওয়ালী ছাড়া সুন্দরবনে প্রবেশ করা মোটেই নিরাপদ নয়। কারণ গুণিন বাওয়ালী সুন্দরবনের রক্ষয়িত্রী দেবী মা বনবিবিকে সন্তুষ্ট করে হিংস্র জীব-জন্তুর হামলার ভীতিকে প্রতিহত করতে পারে। সুন্দরবনের মধ্যে গমনাগমনকারীদের যে বিষয়টি সবচেয়ে আবর্তিত করে তা হলো ভয়। 'ভয়' শব্দটিকে কেন্দ্র করে গোটা সুন্দরবনের জীবনযাত্রা আবর্তিত হয়। গুণিন বাওয়ালীরা সাধারনত যারা পাস সংগ্রহ করে সেই মহাজন বাওয়ালী ও দিনমজুর বাওয়ালী শ্রেণির মধ্যে পড়ে। মহাজন বাওয়ালীরা সুন্দরবন থেকে কাঠ, গোলপাতা সংগ্রহের অনুমতি পেয়ে থাকে। আর যারা দিনমজুর বাওয়ালী তারা মহাজনের অধীনে কাজ করে থাকে।

মাঠ পার্যায়ের জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাওয়ালীদের ৫৪ শতাংশ দিনমজুর বাওয়ালী, ৩৯ শতাংশ মহাজন বাওয়ালী আর অন্যান্য ৭ শতাংশ বাওয়ালীরা সুন্দরবন সংলগ্ন ওয়াপদা রাস্তা বা বেড়িবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে। বেড়িবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে। বেড়িবাঁধ থেকে বেশ ভিতরের গ্রামগুলিতে বাওয়ালীরা বসবাস করে।

মহাজন বাওয়ালী : মহাজন বাওয়ালীরাই কাঠ, গোলপতা সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের এ বনজ সম্পদ সংগ্রহের কাজ শুরু হয় নভেম্বর মাসে শেষ হয় ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে। সাধারণত যে সময় তারা কাঠ কাটতে যায় সে সময়কে বাদা কাটতে যাওয়ার মৌসুম বলা হয়। তারা প্রথমে রেঞ্জ অফিস থেকে বি,এল,সি (Boat License Certificate) পাস সংগ্রহ করে নেয়। ১০-১৫ টাকায় মণ প্রতি গরাণ বা অন্যান্য কাঠের রাজস্ব দিতে হয়। এ কথা সত্য যে, গরান বা অন্য কাঠের ক্ষেত্রে ফরেস্ট অফিসারদেরকে নির্দিষ্ট হারে ঘুষ দিতে হয়। তবে কূপের কূপ অফিসারকে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়। বাওয়ালীদেরকে কূপ অফিসার ছাড়াও বিভিন্ন ডাকাত দলকে চাঁদা দিতে হয়। এক প্রকার বাধ্য হয়েই মহাজন বাওয়ালীরা বন কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে থাকে তবে অধুনা ফরেস্ট অফিসের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এক শ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগী বাওয়ালীদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাওয়ালীরা একবারে ১৫-২০ দিনের জন্য কাঠ কাটার অনুমতি পায়। মহাজন বাওয়ালীরা খুব কমই বাদায় যায়। তাদের অধীনে ৮-১০ জন দিনমজুর বাওয়ালী দল সুন্দরবনে কাঠ, গোলপাতা সংগ্রহ করে থাকে। অনেক সময় মহাজন বাওয়ালী ও মাঝি একই ব্যক্তি হয়ে থাকে। কারণ মহাজন বাওয়ালীর প্রতিনিধি হিসেবে একজন মাঝি থাকে। এরা বছরে ২ থেকে ৩ বার গোলপাতা সংগ্রহ করে থাকে। কাঠ, গোলপাতা সংগ্রহ করতে হলে ঘুষ দেয়ার বিষয়টি অনিবার্য হয়ে পড়েছে। ডাকাতদের উৎপাত ও ফরেস্ট অফিসারদের দুর্নীতির কারণে বাওয়ালীরা এখন আর পূর্বের মত লাভবান হতে পারছে না। এ ছাড়া আরেকটি বিধিনিষেধ বহুলভাবে দৃষ্ট হয় তাহলো কোন প্রকার পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ করে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা এবং কোন রকম ঘোষণা ছাড়াই তা আবার প্রত্যাহার করা। এ রকম ২০০২ সালে বন বিভাগের গৃহীত তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের কারণে অনেক বাওয়ালী তাদের বি,এল,সি নবায়ন করে সুন্দরবনে যেতে পারেনি।[১২] তবে এ পেশাকে তারা আর লাভজনক মনে করছেনা।

দিনমজুর বাওয়ালী : দিনমজুর বাওয়ালীরা সমাজের গরিব, নিপীড়িত, নির্যাতিত ও শোষিত শ্রেণির মানুষ। তাদের নিজেদের মূলধন বা নৌকা নেই। মহাজনের নিকট থেকে চড়া সুদে দাদন নিয়ে তারা সুন্দরবনে বনজ সম্পদ আহরণে যায়। দিনমজুর বাওয়ালী মাটি থেকে উঁচুতে মাচা বানিয়ে তার ওপর রাত কাটায়। সারাদিন তাদের পরিশ্রমের শেষ নেই। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি শেষে তারা সন্ধ্যায় মাচার দিকে আসে। সকলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে 'মালে' নামে আর হিংস্র জীব-জন্তুর ভয়কে উপেক্ষা করে এরা কাজ করে। এ দিকে বাড়িতে তাদের পরিবারবর্গ গভীরভাবে অপেক্ষা করে। একজন দিনমজুর বাওয়ালী গোলপাতা সংগ্রহের মৌসুমে ৬০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করে।

সুন্দরবনে দিনমজুর বাওয়ালীদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ। শ্বাপদ-সংকুল সুন্দরবনে কাজ করার সময় তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমির, বনদস্যুদের আক্রমণ, সর্বোপরি বনকর্মীদের অবৈধ ঘুষ দিয়ে তাদের হাতে কিছু থাকে না বললেই চলে। এসব কারণে দিনমজুর বাওয়ালীরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ও অভাবমুক্ত হতে পারে না।[১৩] তাই তাদের আর্তি অন্য কোন কাজের সুযোগ থাকলে তারা আর এ পেশায় আসতো না। অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তাদের

সংসার চালাতে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তারা মূলত কাজ করে মহাজনের নির্দেশমত। পেশার বাইরে দিনমজুর বাওয়ালীরা অন্যান্য কাজ করে। প্রায় ৮৫% দিনমজুর বাওয়ালী ফরেস্ট অফিস থেকে পাস সংগ্রহ করে সুন্দরবনের খাল, নদীর মাছ, কাঁকড়া সংগ্রহ করে বিক্রি করে থাকে।

গুণিন বাওয়ালী : সুন্দরবনে গমনকারী ব্যাক্তিদের মধ্যে গুণিন বাওয়ালী সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী। কারণ তারা তাদের মন্ত্র বা ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাবলে হিংস্র জীব-জন্তু বা অন্য কোন বিপদ থেকে এরা বনে কর্মরত পেশাজীবীদের রক্ষা করতে পারে বলে সকলে একমত প্রকাশ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ যারা মন্ত্র-তন্ত্র জানে তাদেরকে গুণিন বাওয়ালী এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মন্ত্র-তন্ত্র জানা মানুষকে হুকুমে বাওয়ালী বলা হয়। গুণিন বাওয়ালীরা শুদ্ধমনে জঙ্গলে উঠে প্রথমে ছোট সুন্দরী গাছ হাত দিয়ে 'মাল' করে। 'মাল' করা অর্থ দেব-দেবীর নাম স্মরণ করা যাতে জীব-জন্তু থেকে কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়। তাদের ধারণা, মালের কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী এই মাল কার্যকরী হয় এবং এর মধ্যে কোন জীব-জন্তু থাকলে মন্ত্রের দ্বারা তা নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। এ সব মন্ত্রতন্ত্রের নামও বড় চমৎকার। যথা-দুকে মন্ত্র, চালান মন্ত্র, খিলান মন্ত্র, আলসে দেয়া মন্ত্র।[১৪] অপরদিকে হুকুমে বাওয়ালীরা পীরের রুমাল দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং এরা আলী বদর, শাহ জঙ্গলীর দোহাই দেয়। একজন বাওয়ালীর ৭/৮ জন করে শিষ্য থাকে। এরা বয়সে জ্যেষ্ঠ তাকে বেশ মান্য করে। তবে এ কথা সত্য যে, জঙ্গলে থাকাকালীন গুণিন বাওয়ালীরা সর্বদা পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ থাকে।

বাওয়ালীদের কিছু অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য রয়েছে। যেমন-বনবিবি পূজা বা গাজীর গানে তাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। সুন্দরবন তাদের কাছে এক পবিত্রতম স্থান। শুধু শুক্রবারে হুকুমে বাওয়ালীরা জঙ্গলে ওঠে না। গুণিন বাওয়ালীরা কখনো কাঁকড়া খায় না। নানাবিধ জটিলতা আর সমস্যার কারণে বাওয়ালীরা আর আগের মত জঙ্গলে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। জীবনের নিরাপত্তাহীনতা, ডাকাতের ভয়, পাস পাওয়ার বিড়ম্বনা ইত্যাদির কারণে তাদের আগ্রহ দিনে দিনে কমে যাচ্ছে।

মৌয়ালী : সুন্দরবন প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। মাছ, কাঠ, গোলপাতার পাশাপাশি মধুও এখানের একটি মহামূল্যবান সম্পদ। পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মধু সংগ্রহ করে তারা মৌয়াল, মৌয়ালী বা মৌলে নামে পরিচিত। তারা দলবদ্ধভাবে ছোট বড় নৌকা সহযোগে মৌচাক ভেঙ্গে মধু সংগ্রহ করতে যায়। বেতের ধামা, লগী ও মাটির কলস নিয়ে যায় এরা মধু সংগ্রহ করতে। একটি দলে সাধারণত ১৩ জন লোক থাকে। তাদের মধ্যে একজন থাকে নৌকা পাহারা দেয়ার জন্য। তার কাজ নৌকা পাহারা দেয়া এবং ভাত রান্না করা এবং মধু সঠিকভাবে নির্দিষ্ট পাত্রে সংগ্রহ করা। দলীয় ভাষায় তিনি দারোগা নামে পরিচিত। মধু সংগ্রহ করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কারণ জঙ্গলে মধু সংগ্রহের সময় মৌয়ালদের উপরের দিকে চোখ রেখে চলতে হয়।[১৫] মৌমাছিরা ফুল হতে মধু আহরণ করে কোন দিক দিয়ে উড়ে আসে সেদিকে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে লক্ষ্য করতে থাকে। এমন অসতর্ক মুহূর্তে তাদের বাঘের আক্রমণের শিকার হতে হয় বেশি।

খড়কুটো একত্রে বেঁধে উঁকো বা তড়পা তৈরি করা হয়। তাতে আগুন লাগিয়ে জঙ্গলে ধোঁয়া ছাড়লে মৌমাছি বের হয়ে মৌচাকের দিকে ধাবিত হয়। কোন বিপদ হলে 'কু' সঙ্কেত দিয়ে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করে। মৌয়ালদেরকে প্রতিনিয়ত বাঘের আক্রমণের ভয়ে থাকতে হয়। বাঘের আক্রমনে এ পর্যন্ত বহু মানুষ মারা পড়েছে। ২০০২ সালে আটজন, ২০০৩ সালে আটাশজন ২০০৪ সালে সতের জন বাঘের আক্রমণে মারা পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জেলে, গরানকাটা, গোলকাটা বাউলে, মউলে, বনবিভাগের একজন কর্মচারী এবং একজন ডাকাত। ২০০৩ সালে বন বিভাগের একজন ফরেস্টার ডিঙিমারীতে তার অফিস এলাকাতেই বাঘের হাতে নিহত হন।[১৬] মৌয়ালরা আলাদা কোন সম্প্রদায় নয়। সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে বসবাসরত সাধারণ জনপদের স্থানিক বৃত্তি মৌলেগিরি বা মধু সংগ্রহ করা। এসব মৌলদের পদবী হয়ে থাকে সর্দার, সানা, মোড়ল, গাজী, মোল্লা ইত্যাদি আর হিন্দু মৌলদের পদবী কয়াল, সর্দার, কাগ ইত্যাদি। এরা সারাবছর যে মধু আহরণ করে তা নয়। মধু সংগ্রহের সময় সারা বছরের অন্যান্য সময় এরা মজুর, ঘের মজুর, চিংড়িপোনা ধরা, কাঁকড়া মারা, গরান, গোলপাতা, হেঁতাল, ঘাস কাটা বাওয়ালীর পেশা ধারণ করে।[১৭] সরকারি হিসাব মতে বছরে ৪-৫ হাজার মন মধু সুন্দরবন থেকে আহরিত হয়।

চুনারু : যারা সুন্দরবনে শামুক ও জোংড়া কুড়িয়ে জীবন নির্বাহ করে তারা চুনারু নামে পরিচিত। তারা সরকারি রাজস্বের বিনিময়ে শামুক, জোংড়া, কাঠ কুড়ায়। মূলধন ও নৌকার অভাবে তাদেরকে মহাজনের উপর নির্ভর করতে হয়। শামুক, জোংড়া কুড়িয়ে তা পুড়িয়ে তারা চুন তৈরি করে।[১৮]

মৎস্যজীবী : অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করছে। প্রাচীন চর্যাগীতিতে তা সুন্দরভাবে উল্লেখ আছে:

তারিত্তা ভব জলধি জিম করি মা-অসুইনা
মারু বেনী তরঙ্গ মই মুনি আ।[১৯] (চর্যাগীতি)

তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মাঝ নদী, যেখানে জীবনের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মীনের সন্ধান করছে মানুষ। অধুনা মৎস্য আহরণ শিল্প বানিজ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় যে সব অঙ্গনে মৎস্যজীবীরা বেশি বাস করে তা হলো বরগুনা, পাথরঘাটা, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা। জেলেরা অনেকে তাদের মৌলিক পেশা থেকে সরে এসেছে। তারা অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত। তন্মধ্যে পেশাগত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব, প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাব, রেডিও সিগনাল, বাতিঘর, দিকদর্শন, ঔষধপত্র, খাবারপানি, জলদস্যু ও ডাকাতদের উপদ্রব, বনবিভাগের চাঁদাবাজি ইত্যাদি। মাছ ধরার উপকরণ উন্নত বিশ্বে আধুনিক মানের হলেও আমাদের দেশে এর তেমন কোন উন্নতমানের প্রযুক্তি বা উপকরণের ব্যাপক অভাব রয়েছে। জেলে বা মৎস্যজীবীরা সাধারণত যে সব নৌকায় মাছ ধরে তার নাম ডিঙ্গি, চাঁন্দি, বালাম নৌকা। গঠন, প্রকৃতি এবং ধারণ ক্ষমতা অনুসারে নৌকার দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। আদি বৃত্তিধারী জেলেরা বর্তমানে অনেকটা কমে গেছে। ফলে পেশা পরিবর্তনের ফলে অনেকে মাছ ধরার পেশায় অংশগ্রহণ করছে।

সুন্দরবনের খালে-বিলে অসংখ্য প্রকৃতির মাছ পাওয়া যায়। বাংলার মাছের বর্ণনা কবি দ্বিজ বংশীবদন দাসের 'মনসামঙ্গল' এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে জানতে পারা যায়। যথা-মৃগেল, কাতল, কৈ, মাগুর, ইলিশ, শোল, রুই, বোয়াল, রিটপা, পুঁটি, পাবদা, পোনা, ইচা, ভেকুট, ফলই, আইড়, সোনাখড়কি, চেলা কালবাউস, বাঁশপাতা, ট্যাংরা, ভেদা, কুড়িশা, খলিশা, খড়স্বলা ইত্যাদি।[২০] এগুলি স্বাদু বা মিষ্টি পানির মাছ। আর লোনা পানির মাছের অনেক নাম যথা-চিংড়ি, হাঙ্গর, রুপচাঁদা, টেংরা, চাকুল, টেপা, পারশে, জাবা, ভেটকি, দাঁতনে প্রভৃতি। চিংড়ি মাছের আবার কয়েকটি ভাগ আছে। যথা-ঘুষা, হরিণা, বাগদা, গলদা প্রভৃতি। মাছ শিকারের জন্য পেশাজীবী সম্প্রদায় সুপ্রাচীন কাল থেকে যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে আধুনিককালেও তার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। সেগুলির নাম ঝাঁকি জাল (স্থানীয় ভাষায় খেপলা জাল), ফাঁস জল, পোনা বা ছাঁকনা জাল, বাদাই জাল বা বেড়জাল, ইলশা জাল, বেন্টি জাল এবং চর জাল। এ জালগুলি মাছ ধরার অভিনব কৌশল সমন্বিত। জঙ্গলে মাছ ধরার জন্য ২০০-৩০০ হাত লম্বা এবং ৮-১০ হাত প্রস্থ চর জাল ভাটার চর বরাবর নিচের অংশ পুঁতে রাখা হয় এরপর জোয়ারের সময় জাল উঁচু করে লগি দিয়ে আটকে দেয়া হয়। ভাটার সময় জাল নিচে নামার সাথে সাথে মাছ জালে আটকে যায়। এ ছাড়া মাছ ধরার কাজে সড়কা (বাঁশের তৈরি ত্রিকোণ পাত্র), চোঙ্গা ব্যবহৃত হয়। চোঙ্গা দিয়ে সাধারণত বাইন মাছ ধরা হয়।[২১] আর মাছ রাখার পাত্র হিসেবে খালুই বা হাপর (বাঁশের তৈরি গোলাকার মাছ রাখার পাত্র) ব্যবহৃত হয়।

মৎস্যজীবীরা অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস অর্থাৎ বাংলায় কার্তিকের প্রথম থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্যন্ত সুন্দরবন সংলগ্ন সমুদ্রতটে অবস্থান করে। শরণখোলা রেঞ্জের দুবলার ১৩টি চরে এ সময় জেলেরা অবস্থান করে। এই চরগুলির নাম অফিস কিল্লা, মাঝের কিল্লা, মেহের আলী, আলোর কোল, শোলার চর, নারিকেল বাড়িয়ার চর, ছোট আমবাড়িয়ার চর, বড় আমবাড়িয়ার চর, মানিকখালির চর, কবরখালির চর, চাপড়াখালির চর, কোকিলমনির চর, হলদীখালির চর।[২২] তবে ইদানিং দুবলার চরের কিছু অংশে সরকারিভাবে মাছ ধরা এবং জেলেদের থাকা নিষিদ্ধ হয়েছে। যেমন, কচিখালির চর, কলাতলার চর, কবরখালীর চর, আমবাড়িয়ার চর, বালির চর ও গলাকাটার চর। এসব চরে শুটকি মাছের মৌসুমে প্রায় ২০ হাজার লোক অবস্থান করে। জেলেরা পুরুষানুক্রমিকভাবে এই চরে অবস্থান করে। সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করছে। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ইলিশ মাছ ধরা চলে। তবে মেহের আলি চরে চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়ার জেলেরা বেশি আসে। এরা তীর থেকে ৮-১০ ঘণ্টা ট্রলার চালিয়ে গভীর সমুদ্রে জাল ফেলে মাছ ধরে। এইসব জেলেরা 'জলদাস' নামে খ্যাত। জেলে পল্লীর মালিকদের ডাকা হয় বহরদার বা বহাদ্দার নামে। এক একজন বহরদারির অধীনে এক একটি কিল্লায় প্রায় ৩০০ জন লোক অবস্থান করে। গভীর সমুদ্রে অবস্থানকারী জেলেরা সাগরের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে জাল ফেলে। জাল ফেলার এসব স্থানের নির্দিষ্ট নাম আছে। যেমন-ঝাউতলা, আধমঙ্গল, বড়খাড়ি, ছোটখাড়ি, ডুবোজাহাজ, বয়া ইত্যাদি। সুন্দরবনে অবস্থানকালীন দীর্ঘ ৫ মাস এসব জেলেরা তাদের সমাজ-সংসার এবং প্রিয়জনের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। অবসরে

বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন গান, টেলিভিশন এবং ভিসিআর দেখে তারা সময় কাটায়। তবে এ পেশার সাথে জড়িত জেলে পল্লীর লোকজন সারাক্ষণ মৎস্য আহরণ ও শুকানোর কাজে ব্যস্ত থাকে।[২৩]

রেফারেন্স :

১. কমল চৌধুরী, চব্বিশ পরগনা, উত্তর-দক্ষিণ সুন্দরবন, দে'জ পালিশিং, কলতাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ-৩৮৫ ২. কমল চৌধুরী , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৮৫

৩. সতীশ চন্দ্র মিত্র, যেশোর-খুলনার ইতিহাস, রুপান্তর, খুলনা, পুন:মুদ্রণ ১ম ও ২য় খণ্ড, ২০০১, পৃ-২৯

৪. মোঃ আলী কবির হায়দার, সুন্দরবন পরিচিতি, সুন্দরবন বার্তা, ৬ষ্ঠবর্ষ, ৩য় সংখ্যা, খুলনা, জুন ২০০৩, পৃ-১

৫. কমল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৫

৬. সতীশ চন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯

৭. প্রাগুক্ত, পৃ-২৯

৮. প্রবীর বিশ্বাস, সুন্দরবনের কথকতা, বাদাবন, সুন্দরবন একাডেমী, খুলনা, ২০০৬, পৃ-২৫

৯. নরোত্তম হালদার, গঙ্গরিডি ইতিহাস ও সংস্কৃতি উপকরণ, গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র পত্রিকা, কাকদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গ, ২য় সংস্করণ, ২০০০, পৃ-৬২

১০. প্রবীর বিশ্বাস, দুবলার চরে শিশুশ্রম, সি,ডি,পি, পত্রিকা, খুলনা, অক্টোবর ২০০৪, পৃ-১০

১১. শেখর কান্তি রায়, বাওয়ালীদের পেশার স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৬, পৃ-২৯।

১২. দৈনিক ইত্তেফাক, তাং-১৭ জানুয়ারি ২০০৩।

১৩. আশরাফ-উল-আলম টুটু, সুন্দরবনের প্রান্ত সীমায় জনগণের জীবন-জীবিকা, জুন-২০০৪, খুলনা, পৃ-৩৩

১৪. শেখর কান্তি রায়, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১

১৫. আশরাফ-উল-আলম টুটু, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩

১৬. আতিউর রহমান সম্পাদিত, পরিবেশ পত্র, পুন্য মধুর ঘরে, খসরু চৌধুরী, বর্ষ-৮, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৪, ঢাকা, পৃ-১৪।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩

১৮. আশরাফ-উল-আলম টুটু, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪

১৯. পাগুক্ত, পৃ-৩৮

২০. দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১, পৃ ২২২-২২৩।

২১. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, গতিধারা, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ-৫৬

২২. প্রবীর বিশ্বাস, দুবলার চরে শিশুশ্রম, সি,ডি,পি পত্রিকা, খুলনা, অক্টোবর ২০০৪, পৃ-১০

২৩. সাক্ষাৎকার: সুশান্ত কুমার ঘোষাল, পল্লী চিকিৎসক, মেহের কিল্লা, দুবলারচর, শরণখোলা, বাগেরহটি, তারিখ-৩১ অক্টোবর-২০০৯।

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতেই আস্থা

সাহারা বেগম
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। জনঘনত্বের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। ভৌগলিকভাবে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই দেশ অসংখ্য নদীবিধৌত এক সমতল ব-দ্বীপ, যা ঐতিহাসিকভাবে দুর্যোগপ্রবণ এবং জলবায়ু সংবেদনশীল। জার্মানওয়াচের তথ্য অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০০০-২০১৯ সালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্য বাংলাদেশ ৭ম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল একটি দেশ। তবে কয়েক দশক ধরেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো কৃষির উপর নির্ভরতা কমিয়ে সেবা এবং শিল্পখাতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বৈশ্বিক শিল্পায়ন, প্রযুক্তিগত প্রসার ও উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জ্বালানিখাতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জ্বালানির চাহিদা বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। জ্বালানি চাহিদার প্রধান অংশ পূরণ করছে জীবাশ্ম জ্বালানি। ফলে এই প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে যা জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। এমতাবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের হারকে হ্রাস (ধীরগতি) করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নির্মাণের লক্ষ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির নির্ভরতা কমানো অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর নির্ভরতার কোনো বিকল্প নেই। কাজেই টেকসই সবুজ বাংলাদেশ বিনির্মাণে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতেই আস্থা রাখতে হবে।

প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ :

নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা রিনিউয়েবল এনার্জি হলো এমন শক্তির উৎস যা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুনরায় ব্যবহার করা যায় এবং ব্যবহারের ফলে শক্তির উৎসটি নিঃশেষ হয়ে যায় না। বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস যেমনঃ সূর্যের আলো ও তাপ, বায়ুপ্রবাহ, জলপ্রবাহ, জৈবশক্তি, ভূ-তাপ, সমুদ্রতরঙ্গ, সমুদ্রতাপ, জোয়ার-ভাটা, শহুরে আবর্জনা, হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ইত্যাদি নবীণকরণযোগ্য জ্বালানির উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। সারা পৃথিবীতে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের উৎপাদন দিন দিন বাড়ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ মানুষের বিদ্যুতের চাহিদার ৮৫ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে পূরণ

করা হবে। অধিকাংশ দেশ তাদের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। নবায়নযোগ্য শক্তিসমূহ পরিবেশ বান্ধব ও কার্বন নিঃসরণ মুক্ত। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও একটি টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থায় পৌঁছানোর জন্য জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাপী পরিবেশবাদী আন্দোলনসমূহ নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে উৎসাহ অব্যাহত রেখেছে। এজন্য আমাদেরও জীবাশ্ম জ্বালানি বাদ দিয়ে নবায়নযোগ্য উৎসের ব্যবহার বাড়াতে হবে। আবার, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানো খুবই দরকারি। এ দুটো একসঙ্গে বাস্তবায়ন করা একটা চ্যালেঞ্জ। তবে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রবর্তন করা খুবই সম্ভব।

বাংলাদেশ এমনিতেই বিশ্ব পরিবেশ দূষণের অন্যতম শিকার। বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির আরেকটি কারণ জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন ও ব্যবহার। জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থাৎ তেল, গ্যাস ও কয়লা ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। ফলে বিশ্বের উষ্ণতা বাড়ছে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের বিশাল এলাকা আজ সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যাওয়ার হুমকির সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় অতিরিক্ত জ্বালানি তেল ব্যবহার পরিবেশকে আরো দূষিত করতে পারে। কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয় কিন্তু এর বিপদের ভাগটা বাংলাদেশকেই অনেক বেশি নিতে হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সমুদ্র উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা, এর ফলে বাংলাদেশের এক পঞ্চমাংশ এলাকা সাগরে চলে যাওয়ার কথা আমরা বেশ কয়েক বছর যাবৎ শুনে আসছি। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অর্থাৎ পরিবেশ দূষণের শিকার দেশগুলো আরো ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে। সুতরাং একটি টেকসই, অর্থনৈতিকভাবে কার্যকরী ও পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানির উৎস খুঁজে বের করা আমাদের শিল্প এবং ভোক্তা সমাজের সময়ের দাবি।

অন্যদিকে নবায়যোগ্য জ্বালানিতে ফেরার জন্য সরকারকে অবশ্যই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যথাসম্ভব কমাতে হবে। কিন্তু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) নির্ধারণ করেও বিগত সরকার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ফেরার ঘোষণা দিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থাৎ কয়লা, গ্যাস ও জ্বালানি তেল নির্ভরতা আরও বাড়িয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। দেশি বিদেশি গবেষণার নেতিবাচক ফলাফল আর পরিবেশবাদীদের নানা প্রতিবাদ সত্ত্বেও নির্মিত রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন সুন্দরবনের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে। নির্মাণের আগে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে যে ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা করা হয়েছিল, বাস্তবে এখন তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস দ্বারা পরিচালিত মূল্যায়নে এ তথ্য উঠে এসেছে। এ কেন্দ্র থেকে নির্গত ক্ষতিকর রাসায়নিকের বিরূপ প্রভাব দৃশ্যমান হচ্ছে স্থানীয় জলজ ও বনজ জীববৈচিত্র্যের উপর। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুন্দরবন সংলগ্ন প্রকল্প এলাকায় (করমজল, হাড়বাড়িয়া, আকরামপয়েন্ট, হিরণপয়েন্ট) কোনো পাখির বাসা দেখা যায়নি, চারণভূমি বিলুপ্ত হয়েছে, গৃহপালিত প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। দেশের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র অপরিহার্য ছিল না। এখন প্রয়োজন হলো সুন্দরবন রক্ষায়

বিদ্যুৎকেন্দ্রটির ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর ঘটানোর।

বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বেড়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (২০২২-২০২৩) বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট জ্বালানি মিশ্রণের ৯৭.২৩% আসে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। এই চিত্র জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে সম্ভাব্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের অনুসন্ধান করার অপারগতা নির্দেশ করে। আশার দিক হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানিখাতের বিকাশ এবং প্রসার ঘটাতে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১০ বছরের কর অব্যাহতি দিয়েছে। এছাড়া নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের ৫% ভ্যাট মওকুফ করেছে। জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার ২০৩০, ২০৪১ ও ২০৫০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানি মিশ্রণে যথাক্রমে ৩০%, ৪০% এবং ১০০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনায় (আইইপিএমপি-২০২৩) নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে অপেক্ষাকৃত কম অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আশার দিক হলো বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা (আইইপিএমপি-২০২৩) নতুন করে রিভিউ করছে এবং এবিষয়ে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত চেয়েছে।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সমস্যা ও বিকল্প সমাধান :

কয়লা পোড়ানোর ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন-অক্সাইডের মতো ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসৃত হয়। এতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং অ্যাসিড বৃষ্টি হয়। কয়লা পোড়ানো গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের অন্যতম বড় উৎস। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। আর কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কারণে বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের ভূমি, জীবিকা ও পরিবেশ হারাচ্ছে। স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষত শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে। বর্তমান বাংলাদেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১৮% কয়লা থেকে উৎপাদিত হয়। দেশে আসন্ন প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘাটতি বিবেচনায় নিয়ে ২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এর ফলে দেশের বায়ু, মাটি, পানির দূষণ এবং এর পাশাপাশি মানুষ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ঝুঁকি বেড়েছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এটি শুধু পরিবেশ রক্ষা করবে না, বরং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষাও নিশ্চিত করবে। পরিবর্তন সম্ভব, যদি আমরা এখনই উদ্যোগ নিই! পরিচ্ছন্ন শক্তি ও ন্যায্য জ্বালানির পথে চলি।

বাংলাদেশে সৌর বিদ্যুতের সম্ভাবনা :

পরিবেশের ক্ষতি, জলবায়ু পরিবর্তন, আমদানি নির্ভর আর্থিক চাপ এবং ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধির যুগে বাংলাদেশ একটি জটিল পথ অতিক্রম করছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো এই পথ জীবাশ্ম জ্বালানি এবং দূষণে জর্জরিত ও এটি টেকসই বা সামাজিক ন্যায্যতার কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় না। তাই ন্যায্যতার ভিত্তিতে জ্বালানি রূপান্তর ঘটাতে হবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে দূষণমুক্ত বাতাসে জীবনযাপন

করার ভবিষ্য সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত ও ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন ঘটাতে হবে এবং পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে হবে। একই সাথে দূষণমুক্ত জীবনযাপন করার ভবিষ্য সুযোগ তৈরি করে অর্থনীতি টেকসই ও সমৃদ্ধ হবে। সবুজ জ্বালানি রূপান্তর ঘটাতে যখন সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হয় তখন অজুহাত হিসেবে বলা হয় আমরা এতো জায়গা কোথায় পাবো। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায় ৫ লাখ ৭৬ হাজার একর খাস জমি আছে যেখানে চাষাবাদ করা হয়না, ঘরবাড়ি ও নেই। এসব জমির ১০ ভাগও যদি ব্যবহার করা যায় তাতেই ২৫ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ বসানো সম্ভব। অথচ বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে দেশে চাহিদা আছে ১৩ হাজার থেকে ১৭ হাজার মেগাওয়াট। উৎপাদন করা হচ্ছে ১৩ হাজার থেকে ১৫ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত। আমাদের দেশে অফিস-আদালত, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ, রেলস্টেশন ও বাস টার্মিনালের ছাদের আয়তন ৪৫ কোটি বর্গমিটার। যেখানে ২০ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ বসানো যায়। দেশে প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটার রেললাইন ও প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক আছে। এসব জায়গার ৫ শতাংশও ব্যবহার করলে ৩৬ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ বসানো যায়। আবার নদী ও খালের পাড়েও সৌর প্যানেল বসানো যায়। অন্যদিকে আমাদের দেশে প্রায় ৬ লাখ একর স্থায়ী জলাশয় আছে। মাছ চাষ দেখাশোনার জন্য ৯০ ভাগ জায়গা খোলা রেখে যদি ১০ ভাগও ব্যবহার করা যায় তাহলে প্রায় ৩৪ হাজার মেগাওয়াট ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ বা ফ্লোটোভোল্টাইকস বসানো যায়। চাষাবাদের সাথে সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তিও আবিস্কৃত হয়েছে। একে বলে অ্যাগ্রিভোল্টাইকস। কেউ কেউ একে 'কৃষিবিদ্যুৎ' বলে। জমির মধ্যে খুঁটি পুঁতে তার উপর সৌর প্যানেল বসানো হলে বিদ্যুৎ ও ফসল দুটোই হবে। একেই 'কৃষিবিদ্যুৎ' বলা হয়। বাংলাদেশে ১১ লাখ ৮০ হাজার একর জমিতে শাকসবজি উৎপাদন করা হয়। যদি এর ১০ ভাগও ব্যবহার করা হয় তাহলে ২১ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করা যাবে। তবে আশার দিক হচ্ছে, ব্যপকভাবে না হলেও বাংলাদেশ সোলার শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে ইতিমধ্যে যা 'সোলার প্ল্যান্ট' নামে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকার সোলার হোম সিস্টেম চালু করেছে যার দ্বারা দেশের মানুষ গৃহস্থালিতে বৈদ্যুতিক সুবিধা পাবে। 'সোলার প্ল্যান্ট' ব্যবহারের সফলতাও এসেছে ব্যাপক। দুর্গম অঞ্চলে কিংবা চরাঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

বাংলাদেশে ন্যায্য সবুজ জ্বালানি রূপান্তরে জলবিদ্যুতের সম্ভাবনা :

পড়ন্ত বা স্রোত আছে এমন নদীর পানির চাপকে ব্যবহার করে তৈরি হয় জলবিদ্যুৎ। এটি নবায়নযোগ্য শক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। একবার যদি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা সম্ভব হয়, খুব কম শক্তি ব্যয়ের মাধ্যমে এটি চালানো যায়। জলবিদ্যুৎ পৃথিবীর মোট বিদ্যুতের ২০% এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ৮৮% উৎপন্ন করে। বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের একমাত্র চালু কেন্দ্র হলো কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়। যার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা বর্ষাকালে পৌঁছায় ২৩০ মেগাওয়াট। এটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে একমাত্র বড় আকারের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। তবে এখানেই থেমে নেই জলবিদ্যুতের সম্ভাবনা। দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও পাহাড়-ঝর্ণায় ছোট আকারের জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন : সোমেশ্বরী নদী ৫ মেগাওয়াট,

জাদুকাটা নদী ১৩ মেগাওয়াট, ঝালুখালি নদী ৫ মেগাওয়াট, ধলাই নদী ২ মেগাওয়াট। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঝিরি ও ঝর্ণা ছোট পরিসরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশাল সম্ভাবনা, যা স্থানীয় বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে কার্যকর। জলবিদ্যুৎ কার্বন নির্গমনহীন, সাশ্রয়ী এবং টেকসই। একটি ন্যায্য ও সবুজ জ্বালানি ভবিষ্যতের জন্য বাংলাদেশের জলবিদ্যুৎ খাতের সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগানো জরুরি।

বাংলাদেশে বায়ু বিদ্যুৎ; সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর :

সারা বিশ্বে জলবায়ু সংকট মোকাবেলা ও টেকসই জ্বালানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বায়ু বিদ্যুৎ ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তরের অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জলবিদ্যুৎ ও সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাফল্য অর্জনের পর সরকার অন্য একটি নবায়নযোগ্য উৎস বায়ু হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নজর দিয়েছে। তারই অংশ হচ্ছে উইন্ডমিল বা বায়ুকল। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) বায়ুবিদ্যুৎ প্রসারের লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। তবে, দেশে এ খাতের অগ্রগতি এখনও ধীরগতিতে চলছে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে কয়েকটি স্থানে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়েছে যেমন : ফেনীর সোনাগাজিতে, কক্সবাজারের কুতুবদিয়া ও খুরুশকুল। মোংলায় আরও একটি বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া ডেনমার্ক বাংলাদেশে ১.৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে আগ্রহী। যার মাধ্যমে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন অফশোর (সমুদ্রভিত্তিক) বায়ু বিদ্যুৎ প্লান্ট নির্মিত হবে। সমুদ্রে এ প্রকল্প নির্মিতব্য হওয়ায় এতে জমি অধিগ্রহণ বা উচ্ছেদের মতো জটিল ও অন্যায্য প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ৬,১৪৫ মেগাওয়াটের যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তার বাস্তবায়নে সরকারি, বেসরকারি ও নাগরিক পর্যায়ে আরও দ্রুত ও কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিকার্বনীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিউপনিবেশায়ন– এই তিনটি মূলনীতির ভিত্তিতে ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর নিশ্চিত করতে পারে। এটি বিদ্যুৎখাতকে অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সবার জন্য সাশ্রয়ী করে তুলতে সাহায্য করবে।

রপ্তানীখাত পোষাক শিল্পকে বাঁচাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি :

বাংলাদেশে প্রায় ৪,৫০০ টি পোষাক কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ২২৯ টি কারখানা নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করছে। ৯৫% পোষাক কারখানা এখনো জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে, যা ব্যয়বহুল ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশের এসব গার্মেন্টসের উৎপাদিত পোষাকের অন্যতম গন্তব্য ইউরোপ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তৈরি পোষাক আমদানিকারক বেশ কিছু দেশ আগামীতে আমদানির শর্ত হিসেবে টেকসই জ্বালানির শর্ত জুড়ে দিতে যাচ্ছে। চলমান ইউক্রেন অস্থিরতা ইউরোপকে আরও বেশি ও দ্রুত জীবাশ্ম জ্বালানি বিমুখ করে তুলেছে। তাই সময়ের মধ্যেই যদি বাংলাদেশের পোষাক কারখানাগুলো টেকসই জ্বালানি রূপান্তর না করে তবে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশ পিছিয়ে যাবে। ভারত, ভিয়েতনাম ও বিশেষত চীন নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও দেশের রপ্তানী খাত রক্ষায় আমাদের অতিদ্রুত ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববাজারের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে।

উপসংহার :

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস পৃথিবীকে জলবায়ু বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য 'শূন্য কার্বন' এর ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন জীবনশৈলী গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে ১৩ নভেম্বর ২০২৪ সালে কপ-২৯ এর ওয়ার্ল্ড লিডার্স ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটের উদ্বোধনী অধিবেশনের ভাষণে তিনি এ পরামর্শ দেন। তিনি বলেন "এই জীবনযাত্রা হবে শূন্য কার্বনের ওপর ভিত্তি করে। যেখানে কোনো জীবাশ্ম জ্বালানি থাকবে না, শুধু পুনঃনবায়নযোগ্য শক্তি থাকবে।" তাই এখনই সময় জীবাশ্ম জ্বালানিকে 'না' বলার। এখনই সময় নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তিতে আস্থা রাখার মাধ্যমে সবুজ বাংলাদেশ গড়ার।

তথ্য সূত্র :

নাগরিক দাবি, জাস্ট এনার্জি ট্রানজিশন ইন বাংলাদেশ- (JETnet-BD)

প্রকাশকাল– জুলাই ২০২৪

বিজলি, উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (Clean)

প্রকাশকাল– নভেম্বর ২০২৪

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৩-২০২৪)

নাহ্‌ল

মমতাজ খানম
প্রভাষক ইংরেজি, মোংলা সরকারি কলেজ

তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন, 'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে; ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর; অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর' উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা নাহ্‌ল– ৬৮, ৬৯)

মধু একটি অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্য। তবে স্বাদের পাশাপাশি এর মধ্যে আল্লাহ সুবহানুতায়ালা দিয়েছেন রোগ নিরাময় শক্তি। সেদিক দিয়ে এটি উপকারও বটে। এর মধ্যে রয়েছে ফুল ও ফলের রস এবং তাদের উন্নত পর্যায়ের গ্লুকোজ। এছাড়াও মধুর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি নিজে কখনো পচে না এবং অন্য জিনিসকেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজের মধ্যে পচন থেকে সংরক্ষিত রাখে। এর ফলে ঔষধ তৈরির জন্য তার সাহায্য গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জন্যই ঔষধ নির্মাণ শিল্পে এ্যালকোহলের পরিবর্তে মধুর ব্যবহার শতশত বছর থেকে চলে আসছে।

মধুর একটি অনন্য ভান্ডার বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন 'সুন্দরবন'। বাংলাদেশের মধু উৎপাদনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যদিও চাহিদার অধিকাংশ আসে চাষকৃত উৎস থেকে তথাপি মানুষের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে সুন্দরবনের মধুর প্রতি। সুন্দরবনের ঘন ম্যানগ্রোভ গাছপালা বিশেষত গেওয়া, খলসী এবং পশুর গাছ মৌমাছিদের জন্য প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও খাদ্য সরবরাহ করে। মৌমাছিরা এইসব গাছের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, যা ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে উচ্চমানের। বিভিন্ন মিশ্র ফুলের দ্বারা এই মধু প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয় বলে এটি স্বাদে যেমন অনন্য তেমনি উপকারী।

সুন্দরবনকেন্দ্রিক মধু সংগ্রহ ঘিরে গড়ে উঠেছে এক বিশেষ শ্রেণি-পেশার মানুষ যারা 'মৌয়াল' নামে পরিচিত। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গহীন অরণ্য থেকে মৌয়ালরা সংগ্রহ করে আনে আমাদের অতি কাংখিত বস্তু মধু। 'যায় যায় দিন'– তথ্যসূত্র মতে ২০২১ সালে এই মৌয়ালদের সংখ্যা প্রায় ৪০১৩ জন। ১৮৬০ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে মধু সংগ্রহ শুরু হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোট দেশজ উৎপাদনের ৭৫০ কোটি টাকা আয় হয় মধুর এই খাত থেকে। বন কর্তৃপক্ষ এপ্রিল, মে এবং

জুন এই তিন মাস সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহের জন্য অনুমোদন দিয়ে থাকে। বছরের বাকী সময়টা বেঁচে থাকার তাগিদে তাদেরকে বেছে নিতে হয় এই বনকেন্দ্রিক অন্য কোনো পেশা, মোকাবেলা করতে হয় বহুমুখী চ্যালেঞ্জের। যেমনটি রয়েছে সুন্দরবনের পশুদের দ্বারা আক্রমণের ভয় তেমনি রয়েছে জলদস্যুদের ভয়। এমনকি তাদেরকে স্বয়ং মৌমাছিরই আক্রমণের শিকার হতে হয় যা ক্ষেত্র বিশেষে অতি ভয়ংকর পরিণতি বয়ে আনে। তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষের (সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা যারা সুন্দরবন ও পরিবেশ নিয়ে কাজ করছে) মাধ্যমে এইসব বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন এখন সময়ের দাবী।

মানবসৃষ্ট বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড যেমন বনের অবৈধ বৃক্ষ নিধন, শিল্প-কারখানা স্থাপন, নদীর পানি প্রবাহে বাধা প্রভৃতি কারণে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার সুন্দরবন আজ হুমকির মুখে। আর এর প্রভাব পড়ছে এখানকার জীববৈচিত্র্যের সাথে সাথে এই সুন্দরবনকে ঘিরে যেসব জীবিকা গড়ে উঠেছে সেইসব শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর। পরোক্ষভাবে যা সমগ্র দেশের পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

সৃষ্টিকর্তার এই অনন্য সুন্দরবন আমাদেরকে দেওয়া একটি আমানত। হাদিসে উল্লেখ আছে- রসুল (সা:) এরশাদ করেছেন– সমস্ত মাখলুক (মানুষ, জীব-জন্তু, গাছ-পালা ইত্যাদি আল্লাহ সুবহানুতায়ালার সমগ্র সৃষ্টি) আল্লাহতায়ালার পরিবারভূক্ত। সুতরাং আল্লাহতায়ালার নিকট ঐ ব্যক্তি বেশি প্রিয়, যে তার পরিবারের সাথে সৎ ব্যবহার করে। (মিশকাত; বায়হাকী শু'আব)।

আমাদের চিন্তাশীল আচরণ দ্বারা আমরা রক্ষা করতে পারি এই বনকে, রক্ষা করতে পারি জীব-বৈচিত্র্যকে ধ্বংসের হাত থেকে। নয়তো প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি আমাদের অস্তিত্বও হবে হুমকিস্বরূপ। একটু চিন্তাশীল তো আমরা হতেই পারি!

হরিণ

মোঃ ইব্রাহিম খলিল
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মোংলা সরকারি কলেজ

স্রষ্টার অন্যতম অনুপম সৃষ্টি কাজল নয়না হরিণের সৌন্দর্য আমাদেরকে শুধুই বিমোহিতই করে না, আমাদের চিত্তে আনন্দের খোরাক জোগায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও গবেষকেরা হরিণের সৌন্দর্য ও গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য গল্প, কবিতা ও গান রচনা করেছেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমন তাঁর প্রেয়সীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন–

তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়
সে কি মোর অপরাধ ?

তেমনিভাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হরিণের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন–

তোরা যে যা বলিস ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।
সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়,
যায় না তারে বাঁধা।
সে যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে
লাগায় চোখে ধাঁধা।

হরিণ Artiodactyla বর্গের Cervidae গোত্রের একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। পৃথিবীতে ৪৩ প্রজাতির হরিণ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হরিণের নাম মূস হরিণ। উত্তর আমেরিকা এবং উত্তর ইউরোপে এদের বসবাস। এরা ২.৩৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা এবং ৮১৬ কেজি পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে। অন্যদিকে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট হরিণের নাম পুডু হরিণ। দক্ষিণ আমেরিকায় এদের বসবাস। এরা ৮৫ সে.মি পর্যন্ত লম্বা হয় এবং ৬.৫ থেকে ১৩.৫ কেজি পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে।

বাংলাদেশেও কয়েক প্রজাতির হরিণ দেখা যায়। এর মধ্যে চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, সাম্বার হরিণ, বারোশিঙা হরিণ এবং হগ ডিয়ার অন্যতম। এদের মধ্যে বারোশিঙা ও হগ ডিয়ার বা প্যারা হরিণ বিলুপ্তপ্রায়। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হরিণ সাম্বার। এই হরিণ লম্বায় প্রায় ৬ ফুট এবং উচ্চতায় ৪ ফুট হয়ে থাকে। অঞ্চলভেদে এদের ওজন ১৫০ থেকে ৩২০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের শিং প্রায়

৪০ ইঞ্চির মত লম্বা। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে এ জাতের হরিণ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট হরিণের নাম মাউস ডিয়ার। তবে এই প্রাণীটিকে এদেশে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এই হরিণ এদেশে ছাগুলে লাফা, শোস বা শোসা নামে পরিচিত। এদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৭ সে. মি এবং ওজন প্রায় ৩.৫ কেজি। তবে প্রথম দেখায় অনেকেই এটিকে বিরল প্রজাতির খরগোশ ভেবে ভুল করতে পারেন। বিলুপ্তি ঘোষণার ৩০ বছর পর সম্প্রতি ভিয়েতনামে এই হরিণের দেখা পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের সুন্দরবনে চিত্রা হরিণ ও মায়া হরিণ দেখা যায়। উপমহাদেশীয় হরিণ প্রজাতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চিত্রা হরিণ। এদের মায়াবী চাহনি সত্যিই চিত্তাকর্ষক।

হরিণ বিচরণকারী জীব।তারা প্রধানত কচি পাতা, নরম ঘাস, নরম ফল, অঙ্কুরিত চারা, বাদাম, কেওড়া ও গোলপাতা ফল এবং বিভিন্ন ধরনের শৈবাল খেয়ে থাকে। হরিণ এক লাফে ১৩ হাত পর্যন্ত যেতে পারে। এরা ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কি.মি গতিবেগে দৌড়াতে পারে। একটি হরিণ ১৫ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। আড়াই বছর বয়সের পর থেকে এরা বাচ্চা দেওয়া শুরু করে। হরিণ বছরে দুবার বাচ্চা দেয়।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় হরিণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু হরিণের বেড়ে ওঠার জন্য সহায়ক। তবে বনভূমির সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমে যাওয়ায় এবং অবৈধ হরিণ শিকারীদের আগ্রাসনের ফলে বাংলাদেশে হরিণের সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে। হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা-২০১৭ অনুযায়ী, বন বিভাগ থেকে লাইসেন্স নিয়ে খামার আকারে হাতি ও হরিণ পালনের সুযোগ রয়েছে। ১০ টি হরিণ বা একটি হাতি থাকলেই তাকে খামার হিসেবে গণ্য করা হয়। খামারের জন্য লাইসেন্স ফি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২০ হাজার টাকা, সিটি কর্পোরেশনের বাইরের জন্য ১০ হাজার টাকা এবং প্রতিটি হরিণের জন্য পজেশন ফি ১০০০ টাকা। হরিণের অর্থনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম। দেশ-বিদেশে হরিণের মাংস, চামড়া, শিং ও ক্ষুরের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে হরিণ পালন বিষয়ক বিধানাবলি সহজ করা হলে এদেশে হরিণের অনেক খামার গড়ে উঠবে যা দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আমিষের ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। অন্যদিকে অবৈধ হরিণ শিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে এদেশে হরিণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

সুন্দরবনের মধু

মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মোংলা সরকারি কলেজ

মধু এক প্রকার মিষ্টি ও ঘন তরল পদার্থ, যা মৌমাছি ও অন্যান্য পতঙ্গ ফুলের নির্যাস হতে তৈরি করে। মৌমাছি মধু সংরক্ষণ করে মৌচাকে। এটি উচ্চ ঔষধিগুণ সম্পন্ন একটি ভেষজ তরল, সুপেয়। বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতিতে এর ব্যবহার চিনির চেয়ে অনেক সুবিধা রয়েছে। বাংলাদেশে সুন্দরবনের মধু স্বাদ, রং, হালকা সুগন্ধ এবং ঔষধি গুণাবলীর জন্য প্রসিদ্ধ। সুন্দরবনের বেশিরভাগ মধু কেওড়া গাছের ফুল থেকে উৎপন্ন। সুন্দরবনের মৌয়াল সম্প্রদায়ের লোকেরা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে এবং তা বিক্রয় করে জীবন নির্বাহ করে। মধুর অন্য একটি গুণ হলো এটি কখনো নষ্ট হয় না।

পবিত্র কোরআন-হাদিসে মধু সম্পর্কে যা বলা হয়েছে : মহান আল্লাহর প্রদত্ত এক মহা নিয়ামতের নাম মধু। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) মধু অত্যন্ত পছন্দ করতেন। জান্নাতে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের যে সব নিয়ামত দেবেন, তার অন্যতম হলো মধু। পবিত্র কোরআন ইরশাদ হয়েছে মুত্তাকিদের যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো, তাতে আছে নির্মল পানির নহর, দুধের ঝরনা, যার স্বাদ পরিবর্তন হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু নহর এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝরণা (সুরা মুহাম্মদ, আয়াত ১৫)

মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবিদের মধুর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

মধুর উপদান : মধুতে প্রায় ৪৫টি খাদ্য উপাদান থাকে। ফুলের পরাগের মধুতে থাকে ২৫ থেকে ৩৭ শতাংশ গ্লুকোজ ৩৪ থেকে ৪৩ শতাংশ ফ্রুক্টোজ। ০.৫ থেকে ৩.০০ শতাংশ অ্যামাইনো এসিড, ২৮ শতাংশ খনিজ লবণ এবং ১১ শতাংশ এনকাইম। এতে চর্বি ও প্রোটিন নেই। ১০০ গ্রাম মধুতে থাকে ২৮৮ ক্যালরি।

মধুর উপকারিতা : মধু দেহের তাপ ও শক্তি জুগিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখে। এতে যে শর্করা থাকে তা সহজেই হজম হয়। মধু কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এটি ডায়রিয়া হলে এক লিটার পানিতে ৫০ মিলিলিটার মধু মিশিয়ে খেলে পানিশূণ্যতা রোধ হয়। গাজরের রসের সাথে মধু মিশিয়ে খেলে দৃষ্টি শক্তি বাড়ে।

সুন্দরবনে কি কি ফুলের মধু পাওয়া যায় : সুন্দরবনে যে সকল ফুলের মধু পাওয়া যায় এর মধ্যে খলিশা গরান, কেওড়া, বাইন লতা ইত্যাদি ফুল উল্লেখযোগ্য। তবে এগুলোর মধ্যে খলিশা এবং গরান ফুলের

মধুর স্বাদ সবচেয়ে সুস্বাদু। এই মধুর রং ও ঘ্রাণ উভয়ই অসাধারণ। সুন্দরবনের বেশিরভাগ মৌচাক শিলা মৌমাছি দ্বারা তৈরি।

সুন্দরবনের মধু সংগ্রহের সেরা সময় : সুন্দরবনের মৌয়ালরা প্রতিবছর মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে মধু সংগ্রহ করে। যখন মাছ নিষদ্ধ থাকে। মধু সংগ্রহ একটি মৌসুমী কার্যকলাপ।

সুন্দরবনের মধু সংগ্রহের অনুমতি : বনবিভাগ সূত্র জানায়, প্রতিবছর পহেলা এপ্রিল থেকে সুন্দরবনের মধ্যে মধু আহরণে মৌয়ালদের সরকারি ভাবে পাশ (অনুমতি পত্র) ইস্যু করা হয়। তবে বিশেষ কারণের জন্য একটু পরিবর্তন হতে পারে। চলতি মৌসুমে সাতক্ষীরা রেঞ্জ থেকে এক লাখ থেকে ৫০ হাজার কেজি মধু ও চার হাজার কেজি মোম আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করছে বন বিভাগ।

সুন্দরবনের মৌয়ালদের মধু সংগ্রহের প্রক্রিয়া : মধু সংগ্রহের একটি দীর্ঘ প্রথা রয়েছে। প্রতিবছর মৌয়ালরা ঝুকিপূর্ণ ভাবে সুন্দরবনের গভীরে প্রবেশ করে। তারা গাছের উচু অংশ থেকে মৌচাক সংগ্রহ করে মধু আহরণ করেন। সুন্দরবনের বাঘ এবং অনান্য বন্য প্রাণীর উপস্থিতির কারণে এই কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক। মৌয়ালদের দক্ষতা, সাহস এবং ধৈর্য্য সুন্দরবনের মধু সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে সফল করে।

সুন্দরবনের মধুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব : বাংলাদেশের সুন্দরবনের মধু স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এটি মৌয়ালদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস। তবে এটা একটি মৌসুমী কার্যকলাপ হওয়ার ফলে মৌয়ালদের বছরের বেশিরভাগ সময় বেকার থাকতে হয়।

সুন্দরবনের মধুর পরিবেশগত গুরুত্ব : সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ পরিবেশের ভারসম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে। মৌমাছিরা পরাগায়নে সাহায্য করে, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি করে এবং বনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বজায় রাখে। সঠিকভাবে মধু সংগ্রহ করলে তা পরিবেশ সংরক্ষণেও সহায়তা করে।

চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা : সুন্দরবনের মধু সংগ্রহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বাঘ এবং হিংস্র বন্যপ্রাণীর হামলা। বন ধ্বংস ও পরিবেশ দূষণের কারণে মৌমাছি ও মধু উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও এর জন্য কম দায়ী নয়।

সুন্দরবনের মধু বাংলাদেশের এক অমূল্য সম্পদ। এর পুষ্টিগুণ, স্বাদ এবং বৈচিত্র্য আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। তবে এ সম্পদ রক্ষা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং মৌয়ালদের সুরক্ষা নিশ্চিত করলে সুন্দরবনের মধু একটি টেকসই সম্পদ হিসাবে গড়ে উঠবে।

দুবলার চরের রাস উদ্‌যাপন

দেবদাস বাড়ই
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

দুবলার চর, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি বিশেষ স্থান, যেখানে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক সঙ্গে মিলিত হয়। এই চরটি খুলনা জেলার শরণখোলা উপজেলার অন্তর্গত এবং এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। দুবলার চরে বসবাসরত জনগণ প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সমন্বয় রেখে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনযাত্রা পরিচালনা করে।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব হলো রাস। রাস উদ্‌যাপন একদিকে যেমন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে এটি স্থানীয় মানুষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতীক। রাস উদযাপন ছাড়াও দুবলার চর তার শুটকি পল্লী, বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান, এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত।

দুবলার চর, সুন্দরবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিচিত, যা ম্যানগ্রোভ বন, নদী, সমুদ্র এবং নানা ধরনের জলজ প্রাণী দ্বারা সমৃদ্ধ। এখানে রয়েছে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, যার মধ্যে রয়েছেঃ রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, কুমির, নানা প্রজাতির পাখি, ও নানা ধরনের জলজ প্রাণী।

এই চরটি মূলত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জীববৈচিত্র্যর জন্য বিখ্যাত হলেও, সেখানে বসবাসরত মানুষগুলি তাদের জীবনযাত্রার মূল ভিত্তি হিসেবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্য অনুসরণ করে থাকে। দুবলার চর শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই ভরপুর নয়, এখানকার বাসিন্দারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও গুরুত্ব দিয়ে পালন করে।

একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রাস উদযাপন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো দুবলার চরে এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এটি মূলত রাধা-কৃষ্ণের মিলন এবং কৃষ্ণের রাসলীলার স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়। রাস সাধারণত কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় পালিত হয় এবং সারা রাত ধরে চলে। রাসের সময়, স্থানীয় মন্দিরগুলোতে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয় এবং প্রতিটি মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের ও অষ্ট সখির মূর্তি সাজানো হয়।

দুবলার চরের রাস উদ্‌যাপন আরো এক ধরনের মিলনমেলা হয়ে ওঠে যেখানে গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ অংশ নেয়। প্রতিটি পরিবার শ্রীকৃষ্ণের সম্মানে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করে, এবং সেখানে সাধারণত

পিঠা, মিষ্টান্ন, চিড়া, খিচুড়ি ইত্যাদি খাবার পরিবেশন করা হয়। রাসের রাত জুড়ে চলে নাচ-গান, যেখানে গ্রামবাসী একে অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মেতে ওঠে। এই রাতে, গ্রামের মানুষেরা একসাথে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, এবং সামাজিক বন্ধন তৈরি করে।

দুবলার চর তার প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বিখ্যাত, যা স্থানীয় মানুষদের জীবনধারায় গভীর প্রভাব ফেলে। এখানে রয়েছে বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ বন, যা সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশের একটি বড় অংশ। এই ম্যানগ্রোভ বন ও জলাভূমির মধ্যে দিয়ে চলে এসেছে বহু নদী, ছোট-বড় খাল, এবং শাখা-প্রশাখা, যা পুরো পরিবেশকে একটি রহস্যময়, সুন্দর এবং বৈচিত্র্যময় রূপ দিয়েছে।

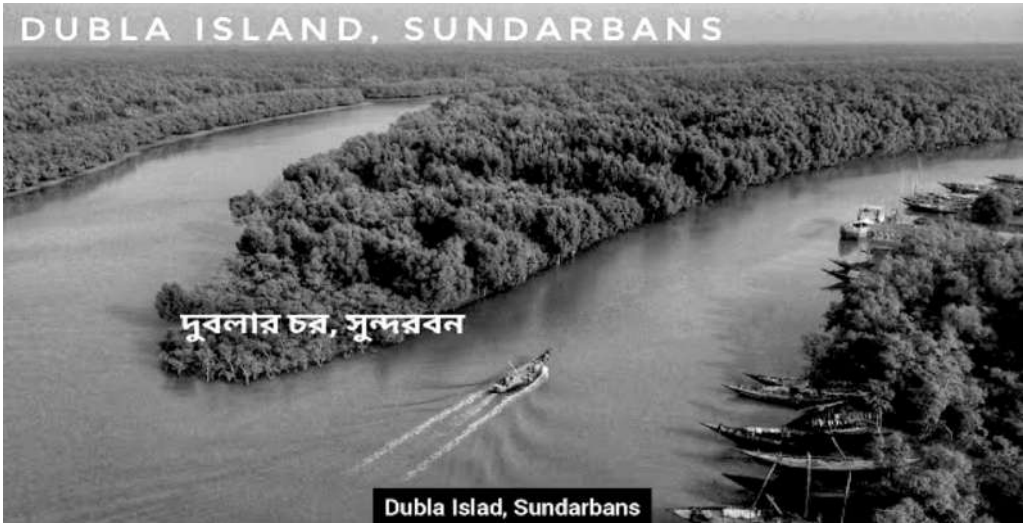

এখানে জীববৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে বন্যপ্রাণী যেমন রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বিভিন্ন ধরনের পাখি, কুমির এবং নানা ধরনের জলজ প্রাণী। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বন উপকূলীয় এলাকা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষাও প্রদান করে।

দুবলার চরের পরিবেশের মধ্যে এখানকার মিষ্টি বাতাস, নীল আকাশ, সাদা বালুকাবেলা, এবং সমুদ্রের নীল জল– সবই রাস উৎসবের অনুভূতিকে আরও গভীর করে তোলে। বিশেষত রাসের রাতে, যখন সারা চর আলোকিত থাকে, তখন প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং উৎসবের আনন্দ এক অদ্ভুত মেলবন্ধন তৈরি করে।

দুবলার চরে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলা হচ্ছে শুটকি প্রস্তুতি। শুটকি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী খাদ্য প্রক্রিয়া। শুটকি তৈরি করা একটি প্রাচীন পেশা যা এখানকার বাসিন্দাদের জীবিকা ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

দুবলার চরের শুটকি পল্লী বিশেষভাবে পরিচিত তার প্রাকৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী শুটকি প্রক্রিয়ার জন্য। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মাছ ধরে তা শুকিয়ে শুটকি তৈরি করে। এই শুটকি তৈরি করার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য হলেও, এটি এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শুটকি প্রস্তুত প্রক্রিয়াটি শুরু হয় মাছ ধরার মাধ্যমে। তারপর সেই মাছগুলো সঠিকভাবে পরিষ্কার করে এবং শুকানোর জন্য বাঙালি ঐতিহ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়। শুটকি শুকানোর জন্য সাধারণত বাতাস ও সূর্যের প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি অনেক দিন ধরে চলে এবং পরিশেষে মাছ শুকিয়ে শুটকি হিসেবে প্রস্তুত হয়। শুটকি সাধারণত খাবারে ব্যবহার করা হয় এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়।

দুবলার চর শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং এখানকার ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহও পর্যটকদের আকর্ষণ করে। কিছু উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যবাহী স্থান যেগুলি রাস উদযাপনসহ অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে :

দুবলার চরের মন্দিরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরগুলো এখানে রাস উৎসবের মূল কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজ করে। মন্দিরগুলোতে পূজা-অর্চনা, ভজন কীর্তন, এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

শুটকি পল্লী একটি ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা যেখানে মাছ শুকানোর প্রক্রিয়া ও শুটকি প্রস্তুত করা হয়। এই পল্লী গুলি এখানকার ঐতিহ্য এবং জীবনধারার অন্যতম অংশ।

সুন্দরবনের বনের মধ্যে অবস্থিত দুবলার চর থেকে শুরু করে এখানকার নদী এবং জলাভূমি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জীববৈচিত্র্যর জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিত। রাস উৎসবের সময় এই অঞ্চলের জলাভূমি আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

দুবলার চর সংলগ্ন সমুদ্রের পাড়, যেখানে স্থানীয় জনগণ মাছ ধরতে যায়, রাস উৎসবের সময় এক ধরনের আলাদা অনুভূতি তৈরি করে।

দুবলার চর, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহ্যবাহী শুটকি পল্লী, রাস উদ্‌যাপন এবং অন্য সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোকে একত্রিত করে একটি অনন্য অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এখানে রাস উৎসব শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক মিলনমেলা, যেখানে মানুষ তাদের ঐতিহ্যকে ধরে রেখে সামাজিক সম্পর্ক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

এছাড়া, শুটকি পল্লী এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন, এখানকার মানুষের সংস্কৃতি এবং জীবনধারা সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। দুবলার চর তার ঐতিহ্য, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে এক বিশেষ স্থান হিসেবে প্রতিটি মানুষের মনে স্থান করে নেবে।

সুন্দরবনের মাছ

নন্দ কিশোর পাল
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

ভোজন রসিক রঙ্গ ব্যাঙ্গের বাঙালি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'তপসে মাছ' কবিতা পড়লেই বোঝা যায় বাঙালি কতটা মাছ প্রিয়–

কষিত-কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁফ-দাড়ি তপস্বীর প্রায়।।
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে।।

প্রাণে নাহি দেরি সয় কাঁটা আঁস বাছা।
ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাঁচা।।
অপরূপ হেরে রূপ পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক গন্ধে পেট ভরে।।

আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির এক অন্যতম অনুষঙ্গ মাছ। বাঙালির 'মাছে-ভাতে উৎপাত'-এর শুরু কবে, তা সঠিক ভাবে বলা মুশকিল। তবে হাওড়-বাওড় আর খাল-বিল,নদী নালার বাংলাদেশে, মাছ বোধ হয় সেই আদিযুগ থেকেই খাওয়া হত। বঙ্গ জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে মাছ আর মাছ। যে কোন অনুষ্ঠান, পার্বণে বাঙালিদের মাছ ছাড়া চলেইনা। শুধু বাঙালিই নয় পৃথিবীর আরো অনেক দেশেই মানুষ কিন্তু মাছ খেয়ে থাকে। ইংরেজরা মাথাপিছু বছরে মাছ খায় প্রায় ৪৯ পাউন্ড, ডেনমার্কের মানুষ মাছ খায় প্রায় ২৪ পাউন্ড। চীন-জাপানিরাও কম যায় না। সেই তুলনায় বাঙালিরা বছরে গড়ে মাথাপিছু মাছ খায় মাত্র ৯ পাউন্ড। অথচ একমাত্র বাঙালিরাই 'মছলী খোর' নামে পৃথিবীতে পরিচিত। তার সংঙ্গে বাঙালিদের মৎস্যপ্রীতি নিয়ে রয়েছে দেদার বদ রসিকতা। আসলে বাংলার মাটি, বাংলার জল বাঙালিকে যে খাদ্য সরবরাহ করে সেটাই তার স্বাভাবিক খাদ্য। এজন্য বোধ হয় বলা হয় 'মাছে ভাতে বাঙালি'। বাঙালি শুধূ মাছ খায়না বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ এদেশের নদ নদী,খাল-বিলে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয় সুন্দরবনের মাছ। সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী

অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি। পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র ত্রয়ের অববাহিকার বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত এই অপরুপ বনভূমির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে প্রায় ১৭৭টি খাল, গাং ও নদীনালা। আর এই সব নদী নালায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু মাছ। সুন্দর বনের মাছের প্রধান উৎস মূলত এই সব নদী ও খাল, এছাড়া সুন্দরবনের ভিতরে যেখানে জোয়ারের পানি ওঠেনা সেখানে বৃষ্টির পানি জমে কিছু স্বাদুপানির মাছ পাওয়া যায়। সুন্দরবনের সামগ্রিক মাছের ওপর পূর্বাপর কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়নি। ফলে মাছের বর্তমান অবস্থা, বিলুপ্ত মাছ ও বিলুপ্তপ্রায় মাছের ওপর উপাত্তনির্ভর তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু মানুষ যেসব মাছ খায় এবং যেসব মাছ রপ্তানি উপযোগী সেসব মাছ চিহ্নিত করা হয়েছে। সুন্দরবনে প্রায় ৩২২ প্রজাতির মাছ পাওয়া গেলেও বানিজ্যিকভাবে আহরিত প্রায় ১২০ প্রজাতির মাছ। সুন্দরবনের মাছকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয় চিংড়ি ও কাঁকড়া এবং সাদামাছ।

প্রথমেই আসি চিংড়ি মাছের কথায়, সুন্দরবনের নদী-খালে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। যেমন গলদা, বাগদা, চাকা, চালি, হরিন্না, বিভিন্ন প্রজাতির গোদা, বাগতারা, ফুল ও কুচো চিংড়ি প্রভৃতি। সুন্দরবনের চিংড়ি দেশের চিংড়ির একটা বড় চাহিদা পূরণ করে। তবে এই চিংড়ির রেনু পোনা আহরণ করতে গিয়ে নেটজাল ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ডিম ও রেনু নষ্ট হচ্ছে। এছাড়াও সুন্দবনের নদীতে বিষ প্রয়োগ করে চিংড়ি ধরা হয় এবং সুন্দরবনের গাছ কেটে শুটকি করা হয়, যা সুন্দবনের জীববৈচিত্র্যকে সংকটের মুখে ফেলছে।

এরপর আসি কাঁকড়ার কথায়, সুন্দরবনের কাঁকড়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় (১) ভূয়া বা ঋষি কাঁকড়া (২) আসল কাঁকড়া বানিজ্যিক ভাবে সাধারণত আসল কাঁকড়া আহরণ করা হয়। চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, হংকংসহ বিভিন্ন দেশে কাঁকড়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় প্রায় ১২ প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়। কাঁকড়ার নাম গুলো বড় অদ্ভুত- মাইলা, হাব্বা, সিলা, মায়া ও সেটরা প্রভৃতি। কাঁকড়া শিকার করে সুন্দরবন এলাকার বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে।

এরপর আসি সাদা মাছের কথায়, সাদা মাছের ভেতর যার নাম আগে আসে সেটা হচ্ছে পারশে, মাছটি জঙ্গলের সর্বত্র পাওয়া যায়। সুস্বাদু এই মাছটির জাতভাই ভাঙন, গুলবাটা, খরুল ভাঙন স্বাদের দিক দিয়ে একে অপরকে টেক্কাদেয়। কোরাল প্রজাতির মাছের মধ্যে সবার আগে আসে ভেটকি মাছের নাম। লাল কোরাল, কালো কোরাল এখন বিলুপ্তির পথে। সুন্দরবনের একটি বড় মাছ কৈ কোরাল/কৈ ভোল আজ বিলুপ্তির পথে। জাবা মাছ সুন্দরবনের সব থেকে দামী মাছের ভিতর একটি, এর পেটের ভেতরে থাকা বায়ুথলির কারণে এর দাম বেশি। দাতিনা, গুটি দাতিনা, লালদাতিনা, পায়রাতলী বা চিত্রা মাছ দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে। আগে সুন্দরবনে কালো কুৎসিত দর্শন গনগইন্যা মাছ বড়শিতে ধরা পড়লেও এখন তেমন একটা পাওয়া যায় না। রেখা মাছ একসময় বেশ দেখা যেতো, ইদানীং দেখা পাওয়া যায়না। সুন্দরবনের নদী-খাঁড়িতে দাপিয়ে বেড়ানো আর একটি সুস্বাদু মাছ লাক্ষা/ইন্ডিয়ান স্যামন (স্থানীয় নাম তাড়িয়াল/গুরজালি)। তপসে (রাম ছোচ) মাছেরও দিন দিন আকাল দেখা দিয়েছে। এক সময় সুন্দরবনের নদী থেকে জেলেরা প্রায় পাঁচ প্রজাতির চেউয়া মাছ

ধরত, যার অনেক গুলো বিলুপ্তির পথে। কুঁচে ও কামিলা জাতীয় মাছের পাঁচটি প্রজাতির অবস্থাও খুব খারাপ। যদিও স্থানীয় লোক জন এটা খায়না, তবে এটি কাঁকড়া ধরার কাজে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে।

বনের বিভিন্ন নদীতে যথেষ্ট পরিমাণ ইলিশ ধরা পড়ে। দুই প্রজাতির ইলিশের মধ্যে চন্দনা ইলিশ এখন কম পাওয়া যায়। চার প্রজাতির ফ্যাসা (ফ্যাকসা) মাছের মধ্যে রাম ফ্যাসা কম পাওয়া যায়। সুন্দরবনের ভেতরের বিলগুলোতে বিভিন্ন প্রজাতির মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায় যার বেশির ভাগই কই, শিং, মাগুর, দুই প্রজাতির টাকি, শোল ছাড়াও ছোট টেংরা, পুঁটি, খলিসা, চ্যালা, দাঁড়কিনা, কুচো চিংড়িসহ নানা মাছ পাওয়া যায়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে এসব বিলে লোনা পানি ঢুকছে। এই বিলগুলোর মাছ তাই শেষ হওয়ার দিন গুনছে।

ক্যাট ফিস প্রজাতির মাছের মধ্যে সুন্দরবনের নদ-নদীতে সব থেকে বেশি ধরা পড়ে নোনা ট্যাংরা। এছাড়াও মেদ, মোচন, গাগড়া, চরগোদা, ছুচো গাগড়া, শোন গাগড়া, গাংট্যাংরা পাংগাস প্রভৃতি। সুন্দরবনের নদীর পাংগাস মাছ খুবই সুস্বাদু। আর কাইন মাগুরের নাম বিশেষ করে বলতে হয় তার বিষাক্ত কাটার জন্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জলদস্যু উপন্যাসে এর কাটার বিষাক্ততার বর্ণনা আছে। একবার কাইন মাছ কাটা ফুটালে আক্রান্ত স্থানে পচন ধরে যায়। সুস্বাদু এই মাছটিকে নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, কাতে (কার্তিক মাসে) কাইন আর চোতে (চৈত্র মাসে) বাইন বেশি সুস্বাদু। বড় কাইন মাগুর এখন কিছু পাওয়া গেলেও দাগী কাইন এখন বিলুপ্তির পথে।

সুন্দরবনের আর একটি জনপ্রিয় মাছ বেলে। বনের নদীতে বেশ কয়েক প্রজাতির বেলে মাছ পাওয়া যায়- চটাবেলে, নুন্দি বেলে, সুন্দরী বেলে, হুন্দ্রা বেলে, গুলে, ডগরী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রতিটা মাছই স্বাদে একে অপরকে টেক্কা দেয়। সাতারে, বাম, সোনা বোগো, সুন্দরবনের নদী গুলোতে আগের মত আর পাওয়া যায় না। খয়রা, চাঁদা, বাশ পাতা, নয় প্রজাতির শাপলা পাতা, বাদুড়, কাইক্কা, লুছো, প্রভৃতি মাছ দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে। সুন্দরবনে এক সময় কালা হাঙ্গর, ইলশা কামট, ঠুঁটি কামট, কানুয়া কামট, পাওয়া গেলেও দিন দিন দক্ষিণে সরে যাচ্ছে।

সুন্দরবনের নদীতে পাওয়া যায় কয়েক প্রজাতির ভোলা বা পোয়া মাছ যার মধ্যে বেশি পাওয়া যায় লাল ভোলা আর সাদা ভোলা। কাঠি ভোলা বা লাউ ভোলা, কটে ভোলা, রুব্বানা ভোলা এবং পুট ভোলা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ভোলা মাছ জাভা মাছের মতো দামী তার বায়ুথলি বা পটকার কারণে। বিভিন্ন কোম্পানি এখন মাছের পটকা সংগ্রহ করে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা অনেক। এই বায়ুথলি থেকে সার্জারির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং কস্‌মেটিকস তৈরি করা হয়। সুন্দরবনের নদীতে মাঝে মাঝে ঝাকে ঝাকে ভোলা মাছ ধরা পড়ে।

সুন্দরবনের নদীতে পাওয়া যায় বেশ কয়েক প্রজাতির পটকা, ট্যাপা বা বেলুন মাছ। শরীরের বিষাক্ততার কারণে স্থানীয়রা এটা খায়না। সুন্দরবনের নদীর মোহনায় বিভিন্ন প্রজাতির ডলফিন পাওয়া যায় যার মধ্যে হামব্যাক ডলফিন, ইরাবতী ডলফিন, শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিল, আর একটা ক্ষুদ্র ডলফিন রিভার

পরপয়েজ শুধু বড় নদীগুলোতে দেখা যায়। তবে ডলফিনের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। সম্প্রতি নদী ও উপকূলীয় এলাকায় ডলফিনের সংখ্যা হ্রাস প্রতিরোধে এবং তাদের আবাসস্থল রক্ষায় 'ডলফিন কনজারভেশন এ্যাকশন প্ল্যান' প্রণয়ন চূড়ান্ত করেছে মন্ত্রণালয়।

জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। সুন্দরবনের নদীতে দিন দিন যেমন মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে তার সাথে সাথে সাদু পানির মাছও মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে। সুন্দরবন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় সমুদ্রের অনেক মাছও উপকূলীয় নদ নদীতে পাওয়া যায়। আর সুন্দরবনের মাছের নাম নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় ঘাটে ঘাটে বদলায় মাছের নাম। সুন্দরবনের মাছকে আমরা যদি এখনই রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ না করি, অবৈধ ভাবে মাছের রেনুপোনা আহরণ, বিষ প্রয়োগ করে মাছ শিকার, মাছের জন্য সুন্দরবনে যে অভয় আশ্রম আছে সেখানে মাছ ধরা ও অভয় আশ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি না করি এবং সরকার কর্তৃক মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় সুন্দরবনে অবৈধ ভাবে মাছ শিকার ও প্রবেশ বন্ধ করতে না পারি তবে অচিরেই হারিয়ে যাবে সুন্দরবনের মাছ। তার সাথে সাথে কর্মহীন হয়ে পড়বে উপকূলীয় মৎস্যজীবীরা যারা সুন্দরবনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাই সবার সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে সুন্দরবনের মৎস ভাণ্ডারকে রক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

পরিবেশ দূষণ ও প্লাস্টিক বর্জন

বীনা বিশ্বাস
প্রভাষক, ভূগোল, মোংলা সরকারি কলেজ

"সবুজ নাশে ব্যাপক হারে
শহর গ্রামে দূষণ বাড়ে।"

দূষণ যেন এক আতঙ্কের নাম। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে আমাদের পরিবেশ। আমরা আমাদের পরিবেশকে নানা ভাবে ব্যবহার করি। ফলে পরিবেশের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন ক্ষতিকর ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশে মিশে যখন জীবের বসবাসের জন্য অনুপোযোগী হয় তখন তাকে আমরা পরিবেশ দূষণ বলি।

একটা সময় ছিল যখন মানুষ দৈনন্দিন প্রয়োজনে মাটির তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহার করত। পরে বাজারে আসে পাটের তৈরি বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন-ব্যাগ, বস্তা, কাপড়, কারপেট ইত্যাদি। তারপর তৈরি হয় প্লাস্টিক যা বিশ্বব্যাপী একরকম বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। এ প্লাস্টিককে তাপে গলিয়ে যে কোন আকার প্রদান করা যায়, দামে সস্তা, দেখতে সুন্দর, ওজনে হালকা ইত্যাদি সুবিধা আমরা দেখতে পাই।

সকালে ঘুম থেকে উঠে টুথব্রাশ ব্যবহার থেকে শুরু করে আমাদের পোশাক, প্রসাধনী, সাথে থাকা মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, হাটবাজারের ব্যাগ এমনকি দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সবকিছুই এখন তৈরি হয় প্লাস্টিক থেকে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে দেখা যায় প্যাকেটজাত বা বোতলজাত খাবার সবক্ষেত্রেই প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে যা শিশু সহ সকল শ্রেণির মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে ।

এছাড়া প্লাস্টিক পদার্থের বিয়োজন খুব কষ্টসাধ্য হওয়ায় প্রাকৃতিক ভাবে মাটিতে মিশে গিয়ে পঁচতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে চারশ বছর। ফলে এটি ততদিন মাটিতে অক্ষত অবস্থায় থাকে যা মাটির পানি নিষ্কাশনে সমস্যা দেখা দেয় ও গুণগত মান নষ্ট হয়। এই প্লাস্টিক যখন বিভিন্ন ভাবে পানিতে মিশে যায় তখন সেটি মাছে খেয়ে নেয় এবং ঐ মাছ খেয়ে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। এটি পানিতে মিশে দূষণ সৃষ্টি করছে এবং সেই পানি পান করে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ছি।

দূষণের তালিকায় শীর্ষস্থানীয় একটি দেশ বাংলাদেশ। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (বাপা) হিসাব অনুযায়ী শুধু ঢাকায়ই প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি পলিথিন ব্যাগ জমা হয়। শুধু পলিথিন

নয় অন্যান্য প্লাস্টিক বর্জ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির। সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশে প্রতিদিন প্রায় চব্বিশ হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হচ্ছে।

ঢাকাসহ সারাদেশে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে আইনের পরিবর্তনের পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বেশকিছু উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও বাস্তবে তার কোন সুফল দেখা যায়নি। প্লাস্টিক দূষণ রোধে জাতীয় মহাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০শতাংশ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের লক্ষমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও ২০২০ সালে প্লাস্টিক রিসাইক্লিংয়ের পরিমাণ ছিল ৩ লাখ টনের মতো যা মোট ব্যবহারের প্রায় ২০ ভাগ মাত্র।

আমরা যদি লক্ষ্যকরি, তাহলে দেখতে পাই ঢাকা শহরের প্রতিটি অলিগলি, ড্রেন, নালা, খাল ও পতিত জলাশয় প্লাস্টিক বোতল ও পলিথিনে বন্ধ হয়ে আছে। আর সেখানে পানিসহ পরিবেশ মারাত্মক ভাবে দূষিত হচ্ছে। সেই বদ্ধ জলাশয়ের দূষিত পানিতে জন্ম নিচ্ছে ডেঙ্গু রোগবাহী এডিস মশাসহ ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফয়েডের মতো নানাধরনের রোগবালাই। এমনি করে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের তৈরি প্লাস্টিক দ্বারা মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে যার প্রভাব ঘুরেফিরে পরিবেশের উপর পড়ছে।

এছাড়া পরিবেশ বিপর্যয়ের আর একটি উপাদান হলো শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার শিল্প কলকারখানা স্থাপিত হয়। আবার কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্গমণকৃত ছাই, সীসা, জিঙ্ক, রং ও প্লাস্টিক কারখানার ক্লোরোফ্লোরো কার্বন প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডলকে অতিমাত্রায় উত্তপ্ত করে তোলে।

মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং ভোগবিলাসিতা অথবা উন্নয়ন চাহিদার কারণে বায়ুমণ্ডল তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। যার ফলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাকে ভয়াবহ মাত্রায় বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস প্রভাবের মত বিষয়সমূহকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আবার মানুষের বিভিন্ন অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ড যেমন যেখানে সেখানে কলকারখানা স্থাপন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, ইটভাটা তৈরি, কৃষিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, বনভূমির গাছকাটা ইত্যাদি কারণে প্রতি মুহূর্তে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ফলে বছরে লক্ষাধিক মানুষের হার্ট এ্যাটাক, স্ট্রোক, হাঁপানি, ফুসফুস ক্যান্সারের মত মারাত্মক রোগে মৃত্যু হচ্ছে।

এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের উত্তর অঞ্চলে দিন দিন যেমন খরা ও বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে তেমনি উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবার সম্ভবনা রয়েছে। ফলে লবণাক্ত হবে ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় পানি। আবাদী জমি লবণাক্ত হবে, কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে এবং সুপেয় পানির অভাব দেখা দিবে। এছাড়া ধীরে ধীরে সুন্দরবনের ও সার্বিক পরিবেশের বিভিন্ন প্রজাতি বিলুপ্ত হতে থাকবে। মানুষ জীবন ও জীবিকা হারাবে।

পরিবেশ বিপর্যয়ের এই করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে হলে সমাজের সর্বোস্তরের মানুষকে সচেতন হতে হবে। যেমন–ক্ষতিকর পলিথিনের বিকল্প হিসাবে পাট, কাপড় ও কাগজের তৈরি ব্যাগ ব্যবহার করতে

হবে। এক সময় পলিথিনের বিকল্প হয়ে উঠেছিল যে কাগজ বা পাটের ব্যাগ তা প্রায় বিলুপ্তির পথে। আইন করে এবং জনসচেতনতা বাড়িয়ে পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করা গেলে হয়তোবা পাটকলগুলো রক্ষা করা যাবে।

এছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কমাতে হবে, জমিতে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। শিল্প-কলকারখানার বর্জ্য থেকে যাতে দূষণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সর্বোপরি ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং বনবিভাগের অনুমতি ছাড়া কোনও প্রকার গাছ কাটা ও বন উজাড় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবেই আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ উপহার দিতে সক্ষম হব। তাই আসুন আমরা একই সুরে সুর মিলিয়ে বলি–

"গাছ লাগাই
পরিবেশ বাঁচাই।"

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

শেফালী মন্ডল
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান, মোংলা সরকারি কলেজ

"সুন্দরবন মায়ের মতন
আমরা তার করব যতন"।

প্রাকৃতিক কারণে সুন্দরবনের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অন্য এলাকার তুলনায় ভিন্ন। সুন্দরবন উপকূলের নিচু নদীবেষ্টিত লবণাক্ত এলাকায় অবস্থিত। প্রতিদিন জোয়ারে এই বন প্লাবিত হয় এবং ভাটায় পানি নেমে যায়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের লবণপানিতে এই বন ডুবে থাকে। তাই লবণাক্ততা এই বনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুন্দরবনের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের নানা ধরনের অভিযোজনের আশ্রয় নিতে হয়। এই উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–

১। **গাছের শ্বাসমূল মাটি ভেদ করে খাড়া হয়ে থাকে :** জোয়ারের সময় লবণাক্ত পানি মাটির ভেতরের বাতাস বের করে ফেলে। ফলে গাছের শিকড় বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জোগাড় করতে পারে না। এজন্য শ্বাসমূল মাটির উপরে বের হয়ে থাকে। এছাড়াও জোয়ার ভাটার সময় পানির টানকে সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অনেক উদ্ভিদের ঠেসমূল বা স্তম্ভমূল থাকে।

২। **সুন্দরবনের গাছগুলো তুলনামূলক খাটো :** অন্যান্য বনে বিশাল লম্বা গাছ দেখা যায়। তবে সুন্দরবনের গাছের উচ্চতা প্রায় একই রকম ও খাটো প্রকৃতির। মূলত সুন্দরবনের গাছগুলো মাটির উপরিভাগ থেকেই প্রয়োজনীয় পানি ও পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে। মাটির গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না তাই গাছের শেকড় মাটির গভীরে যায় না। সুন্দরবনের গাছের শেকড়গুলো ঝোপের মতো। তাই লম্বা লম্বা গাছের জন্য যে ভীত দরকার সেটা সম্ভব হয় না। গাছ একটু বড় হলেই ঝড়ো বাতাসে সেটা পড়ে যায়। গাছের এই বৈশিষ্ট্যর কারণে দূর থেকে সুন্দরবনকে ঝোপের মতো লাগে।

৩। **গাছেই বীজ অঙ্কুরিত হয় :** লবণাক্ত মাটিতে এবং জোয়ার-ভাটার স্থানে বীজ এক স্থানে টিকে থাকতে পারে না। সুন্দরবনের কিছু কিছু উদ্ভিদের ফল গাছে থাকা অবস্থায় অঙ্কুরিত হয় এবং লম্বা ভ্রূণমূল সৃষ্টি হয়। মূল একটু বড় ও ভারী হলে মাটিতে পড়ে এবং নরম কাঁদায় পড়ার সাথে সাথে মাটির গভীরে চলে যায় ফলে জোয়ারের পানিতে তা ভেসে চলে যায় না। যেমন-গরান, গেঁওয়া।

৪ । **পাতায় প্রস্বেদন কম হয় :** সুন্দরবনের গাছ থেকে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পানি কম বের হয়। কারণ লবণপানি থেকে পানি গ্রহণ করতে গাছকে পরিশ্রম করতে হয়। এজন্য গাছ চেষ্টা করে যাতে বেশিক্ষণ পানি ধরে রাখতে পারে।

৫। **লবণাক্ত পানিতে বেঁচে থাকতে পারে :** সুন্দরবনের গাছগাছালি লবণপানিতে বেঁচে থাকতে পারে। এসব গাছে এমন প্রক্রিয়া আছে যাতে লবণ বাদে পানি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান শোষণ করতে পারে।

লবণাক্ত ও কর্দমাক্ত ভেজা মাটির বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। ম্যানগ্রোভ বন হলো সমুদ্র উপকূলবর্তী বন যেখানে জোয়ারের সময় পানি উঠে এবং ভাটার সময় পানি নেমে যায়। সমুদ্র উপকূলবর্তী জোয়ারভাঁটা অঞ্চলে যে বিশেষ ধরনের লোনামাটির উদ্ভিদ জন্মে সেসব উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে। জোয়ারে প্লাবন সমভূমির বেশিরভাগ এলাকায় লবণাক্ত মাটির প্রভাবে ম্যানগ্রোভ বনভূমি সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন।

সুন্দরবনের স্বল্প ও মধ্যম লবণাক্ত অঞ্চলে গোলপাতা জন্মে। এর পাতা প্রায় ৩-৭ মিটার লম্বা হয়। গোলপাতা গাছ গোল নয়, এর ফলগুলো যখন পূর্ণবয়স্ক হয় তখন কাঁদিটিকে গোলাকার দেখায় এজন্য এর নাম হয়েছে গোলপাতা গাছ।

গোলপাতার ব্যবহার : সুন্দরবনের একটি প্রাকৃতিক অর্থকরী সম্পদ গোলপাতা। গোলগাছের লম্বা পাতা দিয়ে গ্রামগঞ্জে ঘরের ছাউনি তৈরি হয়। গরমের দিনে গোলপাতার ঘরে বসবাস বেশ আরামদায়ক। গোলপাতা দিয়ে ঘরের বেড়া ও নৌকার ছাউনি তৈরি করা হয়। বর্তমান সময়ে কিছু রিসোর্ট ও বাংলো বাড়িতে শোভাবর্ধন, আরামদায়ক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য গোলপাতার ছাউনি দেওয়া হয়। গোলগাছের রস দিয়ে তৈরি হয় সুস্বাদু গুড়। গোলগাছের শিকড় মাটির ক্ষয়রোধ করে এবং গোলপাতা ঝড়ের গতিবেগ কমিয়ে দেয়। সুন্দরবনের জেলেরা নদীতে জাল ফেলার সময় রশিতে গোলপাতার ডান্ডি বেঁধে ভাসনা হিসাবে ব্যবহার করে। উপকূলীয় এলাকার ছেলেমেয়েরা গোসলের সময় নদী-খাল-বিল-পুকুরে গোলের ভেলা বানিয়ে আনন্দে ভেলায় করে ভেসে বেড়ায়। কাঁচা অবস্থায় গোলফলের শাঁস খাওয়া হয় যা দেখতে অনেকটা তাল শাঁসের মতো লাগে। গোলফল অধিক পরিমাণ ভিটামিনের উৎস। কৃমি দমন, পানিশূন্যতা পূরণ, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চর্মরোগের চিকিৎসায় এই ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহার করা হয়। সুন্দরবন থেকে বওয়ালিরা গোলপাতা সংগ্রহ করে তা বাজারে বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা অপরিকল্পিতভাবে সুন্দরবনকে ধ্বংস করছে যা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। সুন্দরবনকে রক্ষার জন্য প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং জনগণকেও সচেতন হতে হবে। তাহলেই সুন্দরবন রক্ষা পাবে ।

সুন্দরবনের নামকরণ করা হয়েছে প্রধানত সুন্দরী উদ্ভিদের উপর ভিত্তি করে। তার কিছু বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো –

সুন্দরী গাছের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এটিকে অন্য গাছ থেকে আলাদা করে তোলে। এটি

একটি ম্যানগ্রোভ গাছ যা লবণাক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠে। এর পাতা লম্বা, সবুজ এবং চকচকে হয় যা সুন্দরবনের পরিবেশে এই গাছকে চিনতে সাহায্য করে। এই গাছের কাঠ খুবই শক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী তাই প্রয়োজনীয় কাঠের কাজে এই কাঠ ব্যবহার করা হয়। সুন্দরী গাছের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর শ্বাসমূল। শ্বাসমূল হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের শিকড় যা মাটি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। এটি মাটির মধ্যে থাকা শিকড়গুলোকে শক্তি প্রদান করে বিশেষ করে মাটি যখন লবণাক্ত ও জলাবদ্ধ থাকে। এই গাছের শিকড়গুলো নদীর পাড়কে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে যা বন্যা ও নদীর প্রবাহের সময় স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

উপকারিতা : সুন্দরী গাছের অনেক উপকারিতা রয়েছে। এটি পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রাখে। পরিবেশগত দিক থেকে সুন্দরী গাছ ম্যানগ্রোভ অরণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষায় ভূমিকা পালন করে। এই গাছের শিকড় নদীর তীর এবং উপকূলকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্ষতি কমাতে পারে।

অর্থনৈতিক দিক : সুন্দরী গাছের কাঠ খুবই শক্ত এবং টেকসই। এই কাঠ নৌকা নির্মাণে, বাড়ির ফার্নিচার তৈরিতে এবং ঘরবাড়ির কাঠামোতে ব্যবহৃত হয়। এর কাঠ থেকে তৈরি হয় আসবাবপত্র ও অন্যান্য পণ্যগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা হয় যা স্থানীয় অর্থনীতির জন্য একটি বড় আয়ের উৎস।

সামাজিক দিক : সুন্দরবনের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সাথে সুন্দরীগাছ গভীরভাবে যুক্ত। এই গাছ থেকে প্রাপ্ত পণ্য যেমন কাঠ, ফল এবং ছাল স্থানীয়দের জীবিকার একটি বড় অংশ। এছাড়া স্থানীয় জনগণ অনেক সময় সুন্দরী গাছের শিকড় এবং ছাল থেকে তৈরি ঔষধি পণ্য ব্যবহার করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় রোগের চিকিৎসা করে থাকে।

চালনা বন্দর

নাসির উদ্দিন
প্রভাষক, ইতিহাস, মোংলা সরকারি কলেজ

বর্তমানে যেকোনো দেশের অন্যতম চালিকাশক্তি সমুদ্র বন্দর। বিশ্বের যেসকল দেশে বন্দর রয়েছে সে সব দেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। অর্থনীতির অগ্রসরের ক্ষেত্রে বন্দরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ নদীমাতৃক ও সমুদ্র থাকায় বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম জলপথ। আজ বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর "চালনা বন্দর" সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। বাংলাদেশের বৃহত্তম চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের পরই চালনা বন্দরের অবস্থান। তবে কালের পরিক্রমায় নাম ও স্থান দুটোই পরিবর্তন হয়েছে। তবে এর গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। রাজস্ব আহরণ ও অর্থনীতি সচল রাখতে মোংলা বন্দর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

খুলনা জেলার চালনা এলাকায় ১লা ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে চালনা বন্দরটি যাত্রা শুরু করে। প্রথম ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজ 'দ্য সিটি অব লিয়ন্স' সুন্দরবনের পশুর নদীর জয়মনির ঘোল এলাকায় নোঙর করে বন্দরের কার্যক্রম সূচনা করে। বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের ঐতিহাসিক বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বন্দরটির অবস্থান। বন্দরটির কারণে বাংলাদেশ তথা বাগেরহাটও বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করেছে। দেশ-বিদেশের শত শত জাহাজ পণ্য নিয়ে এখানে নোঙ্গর করে। নাব্যতার সমস্যার কারণে ১৯৫৪ সালেই বন্দরটি মোংলায় পশুর নদীর তীরে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে এখানেও অনেক সময় নাব্যতার সমস্যা দেখা দিয়েছে। চলমান ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা ধরে রাখার চেষ্টা চলছে। মে ১৯৭৭ সালে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামক একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে নাম পরিবর্তন করে 'মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ' হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে বন্দরটি দিনের ২৪ ঘণ্টাই কার্যক্রম পরিচালনা করে। বন্দরটিতে ২২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা জাহাজ প্রবেশ করতে পারে।

মোংলা সমুদ্র বন্দরকে কেন্দ্র করে মোংলা অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। মোংলা ইপিজেড, এলপি গ্যাস, সিমেন্ট কারখানাসহ বহু শিল্পের বিকাশ অব্যাহত রয়েছে। এলাকার বেকার সমস্যা সমাধানে এসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মোংলা অঞ্চল একটি উন্নত, প্রসিদ্ধ, সমৃদ্ধশালী অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রার মান বহু বৃদ্ধি পেয়েছে। সহজে রপ্তানি সুবিধা থাকার কারণে এ এলাকার মৎস্য শিল্প ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে।

এই বন্দর দিয়ে পোশাক রপ্তানি তিন গুণ বেড়েছে। মোংলা বন্দরে গত ১০ বছরে বছরওয়ারি জাহাজ আসার সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। দেশের অর্ধেকের বেশি আমদানি করা গাড়ি এখন মোংলা বন্দর দিয়ে আসে। বেশির ভাগ এলপিজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) আমদানি হয় মোংলা বন্দর দিয়ে। মোংলা বন্দরের এখন যত জাহাজ ভিড়ে, তার এক-তৃতীয়াংশই এলপিজির জাহাজ। মোংলা বন্দর ব্যবহারে নেপাল ও ভুটানের আগ্রহ দীর্ঘদিনের। মোংলা বন্দর থেকে রেলপথটি ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে সহায়তা করবে। নেপাল ও ভুটানের সবচেয়ে কাছের সমুদ্রবন্দর হলো মোংলা। রেলপথ চালু হওয়ায় মোংলা থেকে যশোর, কুষ্টিয়া, ঈশ্বরদী ও দিনাজপুর হয়ে ভারত সীমান্ত দিয়ে ভারত ভূখণ্ড হয়ে নেপাল পর্যন্ত সহজেই পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে। আবার মোংলা থেকে চিলাহাটি হয়ে ভারতের জলপাইগুঁড়ি পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন হবে, এতে ভুটানের জন্য সহজ হবে মোংলা বন্দর ব্যবহার। ফলে দেশের অর্থনীতি আরও বেগবান হবে।

পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর ঢাকার সাথে দক্ষিণ বঙ্গের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোংলা বন্দরের সম্ভাবনার দুয়ার খুলছে। পদ্মা সেতু চালুর পর ঝিমিয়ে থাকা বন্দরটিতে প্রাণ ফিরতে শুরু করেছে। পদ্মা সেতু নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে এই বন্দরের। রাজধানী থেকে সবচেয়ে কাছের সমুদ্রবন্দর মোংলা। ফলে মোংলা বন্দরের পণ্য পরিবহন আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। খুলনার সাথে মোংলার রেলপথ চালু হওয়ার ফলে বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। মোংলা বন্দর একদিকে যেমন এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে, অন্য দিকে দেশের সার্বিক অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বিশেষ অবদান রাখছে। এ বন্দরের কার্যক্রম দিনদিন আরও বৃদ্ধি পাক এবং দেশের সার্বিক মঙ্গল বয়ে আনুক এই কামনা করছি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন

মোঃ কামাল উদ্দিন
প্রভাষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মোংলা সরকারি কলেজ

ছাত্র আন্দোলন হলো ছাত্রদের অধিকার ও ন্যায়বিচার আদায়ে প্রতিবাদের সক্রিয় মাধ্যম। এ ধরনের আন্দোলনে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের অসন্তোষ তুলে ধরেন। পৃথিবীর প্রথম ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় চীনে ১৬০ খ্রিষ্টাব্দে। চীনের ইম্পেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষর্থীরা সরকারের কয়েকটি নীতির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে ছিলেন। সেই আন্দোলন সাধারণ মানুষের মনেও জায়গা করে নিয়ে ছিল। কারাগারে যেতে হয়ে ছিল ১৭২ জন শিক্ষার্থীকে। এ সময় থেকেই ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ হতে থাকে। বাংলাদেশের অভ্যুত্থানেও ছাত্র আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও ভূমিকা রেখেছে ছাত্র সমাজ। যুগে যুগে ছাত্ররাই অধিকার আদায়ে মাঠে নেমেছে । হয়তো জয়ী হয়ে ফিরেছেন, নয়তো ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন :

সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্র আন্দোলনের এক অনন্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন। ১৯৫২ সালের হিসেবে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ট নাগরিক ছিল বাঙালি। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৪ ভাগ। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি শুধু মাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে বাংলাকে রাষ্ট্র করার দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিলে শাসকেরা গুলি করেন। গুলিতে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউর সহ অনেকে নিহত হন। বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের বাংলা ভাষা।

বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন :

বায়ান্নোর যোগ্য উত্তরসূরী হচ্ছে বাষট্টি আর বাষট্টির যোগ্য উত্তরসূরী হচ্ছে একাত্তর। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় বছর। ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর আইয়ুব খান শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এস এম শরীফের নেতৃত্বে ১৯৫৯ সালের ২৬ আগষ্ট তাদের (শরীফ কমিশন) প্রতিবেদন পেশ করেন। এ প্রতিবেদনে সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা সংকোচন নীতির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল। রিপোর্টে শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়। সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকট হয় । ১৯৬২ সালের ১৭ ই সেপ্টেম্বর স্বৈরশাসক আইয়ুব খান গঠিত শিক্ষা কমিশনের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ছাত্ররা দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন। হরতালে পুলিশ দফায় দফায় লাঠিচার্জ, কাঁদানে

গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলি বর্ষণ করেন। এতে শত শত শিক্ষার্থী গ্রেফতার, বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী আহত ও একজন নিহত হন। আন্দোলন চুড়ান্ত পর্যায় পৌঁছালে আইয়ুব খান পিছু হটেন এবং সরকার ২০ সেপেম্বর শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন। সামরিক শাসন প্রত্যাহার, বন্দিদের মুক্তি ও শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে ছাত্রদের বিজয় সূচিত হয়।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান :

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান হলো পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্দোলন। নিপীড়নমূলক সামরিক শাসন, রাজনৈতিক নিপিড়ন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন সহ ছয়দফা দাবী আদায়ে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯৬৯ সালের এ আন্দোলনে বাংলাদেশের ছাত্ররা পাকিস্তানের শাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেন। তারা সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ আন্দোলনে ছাত্ররা মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। এটিই মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ :

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বস্তরের জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়লেও স্কুল.কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্ররা মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের সাহস, শক্তি ও মেধার মহান আত্মত্যাগ ব্যতীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো।

নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন :

১৯৯০ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে স্বাধীন দেশের ছাত্ররা এরশাদ সরকারের পতন ঘটায়। এর জন্য কঠিন আন্দোলন করতে হয়েছে। নূর হোসেন এ আন্দোলনে শহীদ হন। নূর হোসেনের বুকে পিঠে লেখা ছিল "স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তিপাক"। এ আন্দোলনে ছাত্ররা সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং সরকারের পতন নিশ্চিত করেন।

কোটা সংস্কার আন্দোলন :

বাংলাদেশের সব ধরনের সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে কোটার ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের ছাত্ররা কোটা সংস্কারের আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সরকারকে কোটা ব্যবস্থা সংস্কার করতে বাধ্য করা হয়। সরকার কোটা প্রথাই বাতিল ঘোষণা করেন।

নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন :

২০১৮ সালে ঢাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ২ (দুই) জন শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে সড়কের নিরাপত্তার দাবিতে মৃত ছাত্রদের সহপাঠীরা আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থন পায়। সরকারকে সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন :

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সরকারি সেক্টরে চাকুরির কোটা সংক্রান্ত সরকারের ২০১৮ সালের সার্কুলার বাতিল করার পরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ২০২৪ বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা সংগঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। যা কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হয়। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি চাকুরিতে বিদ্যমান ৫৬ শতাংশ কোটাব্যবস্থায় বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমান সুযোগ আদায়। ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন এবং তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একইদিনে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসূচি পালন করেন। ২-৬ জুলাই দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি পালন করেন। ৭-১৩ জুলাই বাংলা ব্লকেড, ১৪ জুলাই গণপদযাত্রার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি প্রদান, ১৮-২২ জুলাই কমপ্লিট শাটডাউন, ৩১জুলাই মার্চ ফর জাস্টিজ কর্মসূচি পালন করেন। পরবর্তিতে ৩ আগস্ট অসহযোগ আন্দোলন, ৫ আগস্ট ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি পালন করা হয়। এই দিন সারা বাংলাদেশে সংঘর্ষে ১০৮ জন নিহত হন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন এবং দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন।

ছাত্র আন্দোলন সবসময় পরিবর্তনের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে ছাত্ররা তাদের অধিকার ও ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলন করেছেন। তাদের সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। যার প্রভাব আজও বিদ্যমান।

কোটা সংস্কার আন্দোলন

ইসরাত জাহান সূচি

শ্রেণি : একদশ, রোল : ২৪২০৮, ব্যবসায় শিক্ষ বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

২০২৪-এর কোটা সংস্কার আন্দোলন হলো বাংলাদেশে সব ধরনের সরকারি চাকরিতে প্রচলিত কোটা ভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে সংগঠিত একটি আন্দোলন। ২০২৪ সালের ৫ই জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের জারি করা পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণার পর কোটা পদ্ধতির সংস্কার আন্দোলন আবার নতুনভাবে আলোচনায় আসে। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পরিপত্র জারি করা হয়েছিল। ঐ পরিপত্রের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে ৯ম গ্রেড এবং ১০ম ও ১৩তম গ্রেডের পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল কোটা বাতিল করা হয়েছিল।

শুরুতে আন্দোলন সভা-সমাবেশের মধ্যে স্থির থাকলেও ১৪ই জুলাই ২০২৪ খ্রি. শেখ হাসিনার বক্তব্যের পর কোটা আন্দোলন অন্য রূপ নেয়।

পরের দিন ১৫ই জুলাই বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীর উপর রড, লাঠি, হকিস্টিক, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা করা হয়। একই সাথে, পুলিশও লাঠি এবং রাবার বুলেট চালায়।

এইসব হামলায় ১৬ই জুলাই থেকে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ১৬ই জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয় আবু সাঈদ। পুরো দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে ঘটনাটি। ১৯শে জুলাই বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট। আন্দোলন থামাতে ব্যর্থ হলে সরকার দেশ জুড়ে কারফিউ জারি করে এবং মাঠে সেনাবাহিনী নামায়।

এইসব ঘটনায় প্রায় ২১ হাজার শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারী আহত হওয়ার পাশাপাশি ৬৭৩ নিহত হন এবং পুলিশ ৫০০ মামলা করে ১১,০০০ এর অধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করে। এছাড়াও পুলিশের গুলিতে নিহত হয় আন্দোলনকারীদের পানি দিয়ে সাহায্য করা মীর মুগ্ধ।

এরপর ৬ আগস্ট ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারীরা পদত্যাগের এক দাবি যোষণা করে। আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা ৫ই আগস্ট পদত্যাগ করে ভারতে চলে যান। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা দেন সেনা প্রধান।

৫ই আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের মাধ্যমে বাংলার ২য় বিজয় অর্জন হয়।

পরবর্তীতে ৮ই আগস্ট ২০২৪ সালে ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে ১৭ সদস্যদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ গ্রহণ করে। উপদেষ্টামণ্ডলীর শপথের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যাত্রা শুরু হয়।

পহেলা বৈশাখ, ১৪৩২

মনি আক্তার
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৩০১৩, বিজ্ঞান বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

এসো হে বৈশাখ, এসো এসো,
নতুন সূর্য ওঠে হেসে।
মুছে যাক গ্লানি, দূর হোক ব্যথা,
নতুন আশায় ভরে যাক কথা।

পহেলা বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম দিন। এটি শুধু একটি ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে নতুন বছর শুরু করা নয়, বরং আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতীয় চেতনার প্রতীক। এই দিনে আমরা সবাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একত্র হয়ে উদ্‌যাপন করি আমাদের বাঙালিত্বকে।

প্রতিটি বছরের ১৪ই এপ্রিল, আমরা নতুন বছরকে স্বাগত জানাই "শুভ নববর্ষ" বলে। হালখাতা, মেলা, মঙ্গল শোভাযাত্রা, পান্তা-ইলিশ খাওয়া, আর রঙিন পোশাকে সেজে উঠা– সব মিলিয়ে পহেলা বৈশাখ হয়ে উঠে উৎসবের দিন। এটি কেবল আনন্দের নয়, বরং সাম্য, ঐক্য ও সংস্কৃতির এক মহা সমাবেশ।

এই দিনে আমরা সবাই একসাথে উদযাপন করি বাংলা নববর্ষকে।

এই দিনে আমরা বলি, "শুভ নববর্ষ।" ছোট-বড় সবাই রঙিন পোশাক পরে বের হয়, একে অপরকে শুভেচ্ছা জানায়।

পহেলা বৈশাখ আমাদের শেখায় পুরোনো কষ্ট ভুলে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে। এটি আনন্দের, মিলনের ও আশাবাদের দিন।

এই নতুন বছরকে বরণ করে নিই নতুন স্বপ্ন আর আশা নিয়ে। প্রতি বছরের মতো এইবার ও মোংলাতে বেশ আনন্দঘন পরিবেশে পালিত হয়েছে পহেলা বৈশাখ। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষার্থীরা নানা সাজে সেজে ওঠে এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে দিনটিকে আনন্দে পূর্ণ করে তোলে। মোংলা উপজেলাতে ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই দিনে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোকান এবং মিষ্টান্ন দেখা যায়। এদিনে সবাই আনন্দ ভাগা ভাগি করে নেয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, নৃত্য, সঙ্গীতসহ মজার কিছু অনুষ্ঠান দেখা যায় এই দিনে।

মোংলা সরকারি কলেজে অন্যান্য বছরের তুলনায় এইবার বেশ আনন্দের সাথে পালিত হয়েছে এই দিনটি। প্রথমে আনন্দ শোভাযাত্রা, তারপর আবৃত্তি ও গানে গানে স্বাগত জানাই নববর্ষকে। সবাই একই তালে গেয়ে উঠে "এসো হে বৈশাখ, এসো এসো" এই সুরে মন ভরে ওঠে আনন্দে। তারপর কলেজের অডিটোরিয়ামে আমরা সকলে নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করি, শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের কাছে থেকে বক্তব্য শুনি। সব মিলিয়ে এবারের নববর্ষ ছিলো অন্যরকম। স্মৃতির পাতায় থেকে যাবে ১৪৩২ সালের ১লা বৈশাখ!

নববর্ষের আনন্দ অটুট থাকুক সকলের মধ্যে,সুস্বাস্থ্য এবং সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাক প্রতিটা হৃদয়।

অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ

মাহিয়া আফরোজ সাবা
শ্রেণি: একাদশ, রোল : ২৪৬৫৯, মানবিক বিভাগ, শিক্ষাবর্ষ : ২০২৪-২৫
মোংলা সরকারি কলেজ

অর্থনীতি মানব সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যার মাধ্যমে মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ, সম্পদের ব্যবহার ও বন্টন এবং উৎপাদনের বিভিন্ন দিক পরিচালনা করে। এই অর্থনীতির চিন্তাধারার ভিত্তি যিনি গড়ে দিয়েছেন, তিনি হলেন অ্যাডাম স্মিথ। তাকে যথার্থভাবেই “আধুনিক অর্থনীতির জনক” বলা হয়। তার অবদান অর্থনীতির জগতে এক বিপ্লব এনেছে, যা আজও বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মূলভিত্তি।

অ্যাডাম স্মিথ ১৭২৩ সালের ৫ জুন স্কটল্যান্ডের কিরকাল্ডি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশব কেটেছে মায়ের সান্নিধ্যে যিনি ছিলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক দর্শন বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তীতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যলয়েও অধ্যয়ন করেন। তার জীবনভর কাজ ও লেখালেখি মানব সমাজ, নৈতিকতা ও অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

১৭৭৬ সালে প্রকাশিত তার অমর কীর্তি “An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations” অর্থনীতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী রচনা। এটি একটি নতুন অর্থনৈতিক দর্শনের জন্ম দেয়। এই বইতেই তিনি শ্রমের বিভাজন (Division of Labour)-এর তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

অ্যাডাম স্মিথের “Invisible Hand” তত্ত্ব অর্থনীতির সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর একটি। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থে কাজ করে, তখন তা অনিচ্ছাকৃতভাবে সামাজের সামগ্রিক মঙ্গলেও ভূমিকা রাখে।

স্মিথ শ্রমের বিভাজনকে উৎপাদনশীলতার মূল চাবিকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তার মতে, যখন কাজ বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, তখন উৎপাদনের দক্ষতা ও পরিমাণ উভয়ই বাড়ে।

অ্যাডাম স্মিথ শুধু অর্থনীতিবিদই ছিলেন না, তিনি একজন নৈতিক দার্শনিকও ছিলেন তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই “The Theory of Moral Sentiments” ১৭৫৯ সালে প্রকাশিত হয় সেই রচনায়

তিনি মানুষের আচরণ, সহানুভূতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নৈতিকতা নিয়ে বিশ্লেষণ করেন।

অ্যাডাম স্মিথ-এর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো :

1. The Theory of Moral Sentiments (1759)

2. The Wealth of Nations (1776)

3. Lectures on Jurisprudence (1762-1763)

4. Essays on Philosophical Subjects (1795)

১৭৬৪ সালে তিনি ডিউক অব বুকলিউচ-এর টিউটর হিসেবে নিয়োগ পান এবং এর সুবাদে ফ্রান্স এ সুইজারল্যান্ডসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে সফর করেন। এই সফরে তিনি সামরিক ফরাসি চিন্তাবিদদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। যা তার অর্থনৈতিক ভাবনার ওপর প্রভাব ফেলে। ১৭৭৮ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকারের Commissioner of Customs পদে নিয়োগ পান এবং এ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। যুক্তরাজ্যে ২০০৭ সালে £20 পাউন্ড নোটে তার ছবি ছাপানো হয়।

অ্যাডাম স্মিথ ১৭৯০ সালের ১৭ই জুলাই স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে মৃত্যুবরণ করেন। অ্যাডাম স্মিথের কর্মজীবন মূলত শিক্ষা, গবেষণা, লেখালেখি ও দর্শনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে শুরু করে একসময় বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত মহান চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিদে পরিণত হন।

বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর

দীক্ষা ঘরামী

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ২৪৫০১, মানবিক বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

মোংলা বন্দর : বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে খুলনা বিভাগে অবস্থিত একটি সমুদ্র বন্দর। এটি বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম এবং ২য় ব্যবস্ততম সমুদ্র বন্দর। এটি খুলনা মহানগরীর দক্ষিণ-পূর্বে পশুর নদীর তীরে অবস্থিত। বন্দরটি ১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বন্দরের আদি নাম চালনা বন্দর। এটি প্রথমে খুলনার চালনাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বন্দরের জন্য প্রেয়োজনীয় ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে চালনা থেকে কিছুদূর সামনে খুলনা-বাগেরহাট জেলার সীমান্তে মোংলায় স্থানান্তরিত হয়।

ইতিহাস : পূর্ব বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সেবা দেয়ার জন্য ১৯৫০ সালে এই বন্দরটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শুরুর দিকে এটি চালনা বন্দর নামে পরিচিত ছিল। ১৯৫০ সালে এটি প্রতিষ্ঠা লাভের পর চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামে একটি সরকারি অধিদপ্তর হিসাবে যাত্রা শুরু করে এবং মে ১৯৭৭ সালে, চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামক একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে যা পুনরায় ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে নাম পরিবর্তনপূর্বক "মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ" হিসেবে যাত্রা শুরু করে।

ভৌগোলিক অবস্থান : এই বন্দরটি চালনা থেকে পশুর নদীর ১১ মাইল (১৮ কিলোমিটার) উজানে গড়ে উঠে। ১৮৫০ সালের ১১ ডিসেম্বর বন্দরটি বিদেশি জাহাজ নোঙরের জন্য উন্মুক্ত হলে একটি ব্রিটিশ বণিক জাহাজ বন্দরে প্রথম নোঙর করে। সমুদ্রগামী জাহাজ নোঙরের ক্ষেত্রে মোংলা অধিকতর সুবিধাজনক বিধায় ১৯৫৪ সালে বন্দরটি মোংলায় স্থানান্তরিত হয়। তখন মোংলা বন্দর দীর্ঘদিন ধরে চালনা নামেই পরিচিত হতে থাকে। পাকিস্তান আমলে একজন বন্দর পরিচালকের ওপর মোংলা বন্দরের প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, যার প্রধান কার্যালয় ছিল খুলনা শহরে। সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচলের উপযোগী গভীরতা হারিয়ে ফেলায় পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে ১৯৮০ সাল থেকে বন্দরটি প্রায়ই বন্ধ করে দেওয়া হতো এবং প্রতিবারই খননের পর এটি আবার জাহাজ নোঙরের জন্য উন্মুক্ত করা হতো।

বন্দরের অবকাঠামো : এই বন্দরের ১১টি জেটি, পণ্য বোঝাই ও খালাসের জন্য ৭টি শেড এবং ৮টি ওয়্যারহাউজ রয়েছে। নদীর গভীরে রয়েছে ১২টি ভাসমান নোঙরস্থান। হিরন পয়েন্টে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নাবিকদের জন্য একটি রেস্ট হাউজ নির্মাণ করেছে। এই বন্দরটি বাংলাদেশ রেলওয়ের

মাধ্যমে খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকার সাথে সংযুক্ত।

জাহাজ সেবা : ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৯৭০টি বাণিজ্যিক জাহাজ এ বন্দরে নোঙর করে। যা বন্দরটিতে বাণিজ্যিক জাহাজ আগমণের নতুন রেকর্ড প্রায় সকল প্রধান বন্দরের সাথে এই বন্দরের সংযোগ আছে, যদিও এখানে বেশিরভাগ জাহাজ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা থেকে আসে। মাঝে মাঝে কিছু জাহাজ লাতিন আমেরিকা বা আফ্রিকার দেশগুলি থেকে আসে শতশত জাহাজ প্রতি বছর এই বন্দর ব্যবহার করে, যেগুলোর বেশিরভাগ সিঙ্গাপুর, হংকং এবং কলম্বো দিয়ে আসে। ঢাকা এবং নরায়নগঞ্জ বন্দরসহ বাংলাদেশের বেশিরভাগ নদীবন্দরকে এটি সংযুক্ত করেছে।

ভারতের সাথে একটি উপকূলীয় জাহাজ চুক্তির মাধ্যমে মোংলা প্রতিবেশি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাথে জাহাজ রুটে সরাসরি কলকাতা বন্দরকে সংযোগ করেছে। থাইল্যান্ডের সাথেও একটি উপকূলীয় জাহাজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ব্যবসা বাণিজ্য : বর্তমানে বন্দরটি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে, পণ্য খালাসের জন্য ২২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারে। নোঙরের জন্য একটি বাধ্যতামূলক খোলামেলা দীর্ঘ চ্যালেন রয়েছে এবং উভয় পার্শ্বে ৩৩টি জাহাজ একই সাথে পণ্য খালাস বা বোঝাইয়ের জন্য সুবিধা পায়। প্রতি বছর এই বন্দরে প্রায় ৪০০টি জাহাজ নোঙর করে এবং বছরে গড়ে ৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন পণ্যের আমদানি-রপ্তানি সম্পন্ন হয়।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

নাঈমা

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ২৪৫১৭, মানবিক বিভাগ, মোংলা সরকারি কলেজ

প্রথম জীবন : রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর জন্ম ১৯৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর বরিশাল আমানত গঞ্জ রেডক্রস হাসপাতালে। তার মূল বাড়ি বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার সাহেবেরমেঠ গ্রামে। তার বাবার নাম ডা. শেখ ওয়ালিউল্লাহ ও মায়ের নাম শিরিয়া বেগম। রুদ্রের লেখাপড়ায় হাতে খড়ি আর লেখালেখিতে আগ্রহ দুটোই তৈরি হয় নানা বাড়িতে। সে সময় ঢাকার বিখ্যাত 'বেগম' আর কলকাতার 'শিশুভারতী' পত্রিকা আসতো তার নানাবাড়িতে। সাথে রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের বইপত্র তো ছিলই। রুদ্র মজে যান এসবের মধ্যে। নানাবাড়ির পাঠশালায় ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। এরপর ১৯৬৬ সালে ৪র্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন মোংলা থানার সেন্ট পল্স স্কুলে। এই স্কুলেই রুদ্র একসময় ৯ম শ্রেণিতে উর্ত্তীণ হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তার আর ৯ম শ্রেণিতে পড়া হয়নি। যুদ্ধ শেষে ৯ম শ্রেণি টপকিয়ে ১০ম শ্রেণিতে ভর্তি হন ঢাকার ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলে। এখান থেকেই ১৯৭৩ সালে ৪টি বিষয়ে লেটার মার্কসহ বিজ্ঞান শাখায় ১ম বিভাগে রুদ্র এসএসসি পাশ করেন। এরপরে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। পিতামাতার ইচ্ছা ছিল রুদ্র ডাক্তার হোক। কিন্তু রুদ্র বিজ্ঞান বিভাগে না গিয়ে পছন্দের মানবিক শাখায় ভর্তি হয়।

ঢাকা কলেজে এসে রুদ্র পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেন। সহপাঠী হিসেবে পেলেন কামাল চৌধুরী, আলী রিয়াজ, জাফর ওয়াজেদ, ইসহাক খানসহ একঝাঁক তরুণ সাহিত্যকর্মীকে। ১৯৭৫ সালে রুদ্র উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন ২য় বিভাগে। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৭৮ সালে রুদ্র ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মনোনয়নে সাহিত্য সম্পাদক পদে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কামাল চৌধুরী ও আলী রিয়াজ। রুদ্র সরাসরি কখনো রাজনীতিতে না এলেও ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রকাশ করেন তার রাজনৈতিক বিশ্বাস। রুদ্র ছিলেন ঢাবির সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র। ১৯৭৯ সালে তার অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ক্লাসে উপস্থিতির হার কম থাকায় তৎকালীন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর আহমদ শরীফ তাকে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেননি। পরের বছর ১৯৮০ সালে তিনি অনার্স পাস করেন। এরপর নানা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় আবারও পিছিয়ে পড়েন রুদ্র। ১৯৮০ সালে নেন এমএ ডিগ্রি। ছাত্রজীবনেই রুদ্রর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, 'উপদ্রুত উপকূল" ও "ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম:। দুটি বইয়ের জন্যই রুদ্র যথাক্রমে ১৯৮০

ও ১৯৮১ সালে সংস্কৃতি প্রবর্তিত মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

দাম্পত্য ও বিচ্ছেদ পরবর্তী জীবন : রুদ্র বিয়ে করেন ২৯ জানুয়ারি ১৯৮১ সালে। স্ত্রীর নাম নাসরিন। পরবর্তীতে তিনি তসলিমা নাসরিন নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন ও নিজের বিতর্কিত লেখালেখির জন্য আলোচিত হন। তসলিমা মূলত চিকিৎসক ছিলেন। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়ে তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। রুদ্র ও তসলিমার পরিচয় লেখালেখির সূত্র ধরে। পরিচয় ক্রমে রূপ নেয় প্রণয়ে। কবি হিসেবে রুদ্র তখন মোটামুটি পরিচিত। তসলিমাও তখন মেডিকেল ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চায় অগ্রণী সম্পাদনা করেন "সেঁজুতি" নামে একটি অনিয়মিত সাহিত্যপত্র। রুদ্র বিয়ে করেছিলেন সামাজিক প্রথা ভেঙে, পরিবারের অমতে। রুদ্র তসলিমার দাম্পত্য জীবন ভালোই কাটছিল। রুদ্রের উৎসাহ ও প্রেরণায় তসলিমাও পুরোপুরি জড়িয়ে যান লেখার জগতে। কিন্তু রুদ্র-তসলিমার দাম্পত্য জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ছয় বছর শেষে তারা আলাদা হয়ে যান। ১৯৮৬ সালে উভয়ের সম্মতিতে তালাক হয়। বিচ্ছেদের পর রুদ্রের বিরুদ্ধে তসলিমা নানারকম অভিযোগ তুলেছেন। এক পর্যায়ে গোটা পুরুষজাতির বিরুদ্ধেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে তার কলম। পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিতে রুদ্র আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেননি কিংবা তসলিমার উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের জবাবও দেননি। বিচ্ছেদ তাকে কষ্ট দিয়েছে, সে কথা তিনি বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে বলেছেন। রুদ্রের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সাংবাদিক শিহাব মাহমুদের করা একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়– রুদ্র ছিলেন বরাবরই উড়নচণ্ডী স্বভাবের ও যাবতীয় নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে। তিনি ভেবেছিলেন তসলিমাও তারই মতো। প্রচলিত নিয়ম-নীতির প্রতি একধরনের অবজ্ঞা তিনি তসলিমার মাঝেও দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি আবিষ্কার করেন তসলিমার ভেতর তার ভাষ্যমতে এক গোঁড়া, সংকীর্ণ রমনীর বসবাস। তিনি তাঁর মতো করে গড়ে নিতে চেয়েছিলেন রুদ্রকে। তাই সংঘাতটা অনিবার্যই ছিল।

শেষ জীবন : রুদ্রর জীবন নিয়ন্ত্রিত ছিল না। শরীরের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করতেন। অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান এবং খাবারে অনিয়ম সব মিলিয়ে বাঁধিয়েছিলেন পাকস্থলীর আলসার। পায়ের আঙ্গুলে হয়েছিল বার্জাস ডিজিজ। গুরুত্ব তিনি কখনোই দেননি এসবকে। অসুস্থতা নিয়েও তিনি ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা পড়তে যেতেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি নিয়মিত আসতেন নীলক্ষেত-বাবুপুরায় কবি অসীম সাহার 'ইত্যাদি'তে। এ সময়টায় তিনি অনেক নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। কেউ তাকে সমান্য আশ্রয় দেয় নি। কেবল অসীম সাহা দিয়েছিল, নীলক্ষেতে তার টেবিলের বাঁ-পাশে রুদ্রকে একটি চেয়ার দিয়েছিল বসবার জন্য। রুদ্র কেবল ঐ একটি চেয়ারে বসেই সকাল, দুপুর, বিকেল পার করতো। বিকেলে অসীম সাহার প্রেসের আড্ডাটি জমে উঠতো। এখানে যোগ দিতেন কবি মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, সাহিত্যিক আহমদ ছফা, চিত্রকর সমর মজুমদার, সঙ্গীত শিল্পী কিরণচন্দ্র রায়, কবি কাজুলেন্দু দে প্রমুখ। একদিন এই আড্ডাতে রুদ্রকে আর উপস্থিত পাওয়া যয়ানি। অসীম সাহার কাছ থেকেই সবাই জানতে পারেন রুদ্র পেপটিক আলসার বাঁধিয়ে হাসপাতালে। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের ২৩১ নাম্বার কেবিনে অসুস্থ রুদ্র দেখতে যান অনেকেই। হাসপাতালে

সপ্তাহখানেক থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ২০ জুন রুদ্র বাসায় ফেরেন। পরের দিন ২১ জুন ১৯৯১ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করতে কবি বেসিনে দাড়ান। হঠাৎ মুখ খুবড়ে বেসিনের উপরেই পড়ে যান। সিরামিকের বেসিন কবির ভার বইতে না পেরে গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। কবির ভাই ডক্টর মুহম্মদ সাইফুল্লাহ জানান. সাডেন কর্ডিয়াক অ্যারেস্ট। রুদ্রের মুত্যুর সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। মুষড়ে পড়েন দেশে ও দেশের বাইরে থাকা কবির বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা। পরদিন ২২ জুন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ চলে যান অন্তিম শয়নে তার চিরচেনা শৈশবের স্মৃতিধন্য, মোংলার মিঠেখালিতে।

তথ্যসূত্র : Wikipedia

ইচ্ছেমতি

মনোজকান্তি বিশ্বাস
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মোংলা সরকারি কলেজ

মনের নদী ইচ্ছে নদী
ইচ্ছে ডানা মেলে,
বিশ্ব জোড়া উড়ান পাখি
ফুলের দিশা পেলে।

ঐ যে নদী ইছামতি
তারই সাথে আড়ি,
পাল্লা দিয়ে গহীন স্রোতে
দেব ভীষণ পাড়ি!

মনের নদী বনের নদী
ধারা একই বয়,
ইচ্ছে হলে দুয়ে মিলে
মনের কথা কয়।

দুই নদীতে বয় যে স্রোত
একই সুরে তানে,
তার মত কী পারবে কেহ
ছুটতে কালের পানে?

বিজন পথে আপন মনে
মনের বৈঠা বাই,
সুখে দুঃখে সময় গেলে
কালের সুরে গাই।

অপেক্ষা

মমতাজ খানম
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
মোংলা সরকারি কলেজ

কথা ছিল, তুমি আসবে
এমনি মায়াবি চন্দ্রিমা রাতে
তুমি আর আমি চলে যাব
দূরে বহু দূরে-------

সিদ্ধার্থের মত গৃহত্যাগী হতে নয়,
রূপালি চাঁদের ছড়ান রঙে
দুটি হৃদয়কে রাঙাতে।

আমি সেজেছি তোমার সবচেয়ে প্রিয় সেই সাজে-
নীল শাড়ী, নীল চুড়ি, খোঁপায় পরেছি বেলী ফুলের মালা।
তুমি আসবে-
অপেক্ষায় প্রহর গুনতে গুনতে
রূপালি জোছনা ধুসর হয়,

উচ্ছ্বসিত রাত্রি নিস্তেজ হয়ে পড়ে
ঠিক আমারই মতো।

অতঃপর এমনি একটি রাতের আশায় নতুন করে বাঁধে বুক,
এমনি ভাবেই কাটে দিনের পর দিন,
কিন্তু তুমি----------

নববর্ষের কবিতা

মোসাঃ নিলুফা খাতুন
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
মোংলা সরকারি কলেজ

বসন্তকাল আসলে পরে গাছ গাছালি মজা
সবাই মিলে উড়িয়ে দিল কিশলয়ের ধ্বজা।
সেজেগুজে চলল সবাই উৎসবে যোগ দিতে
শিমুল পলাশ সবার মাথায় টুকটুকে লাল ফিতে।
কৃষ্ণচূড়ার মতন আছে স্বর্ণকুড়ি কার?
জারুল পারুল ভাই বোনেতে করছে কি হাঙ্গামা
ওদের যে চাই গোলাপি আর বেগুনি রঙের জামা
আলোকসজ্জা নইলে কি আর এমন শোভা খোলে?
আমল তাসের ডালে সোনার ঝাড় লণ্ঠন দোলে।
মুখ লুকিয়ে শুকিয়েছিল মাদার গাছের ডাল
দখিন হাওয়ার খবর পেয়ে সাজল লালে লাল।
ভিনদেশী এক অতিথ এলো সাকিন মাদুরাই
নাম খানি তার ছায়াতরু রূপের সীমা নাই।
রুদ্রপলাশ নামটি বড্ড কঠিন এবং ভারী
কমলা রঙের পাগড়ী তাহার কেমন মনোহারী।
এমনিতর নানান সাজে সেজে সকল গাছ
সবাই মিলে করল শুরু মহোৎসবের নাচ।
নাচে গানে খুশির টানে উঠল সবাই মেতে
কেউ দেখেনি দূরের মাঠে কে ছিল ওৎ পেতে
হিংসুটে এক কালবৈশাখী হঠাৎ এলো তেড়ে
ঝাঁপিয়ে পড়ে গাছ গাছালি সজ্জা নিল কেড়ে
ফেলল ছিঁড়ে নতুন জামা ঝাঁকিয়ে দিল চুল
পথেরে ধূলোয় লুটিয়ে দিল সদ্য ফোটা ফুল।
ধ্বংসলীলা সাঙ্গ করে উধাও হলো শেষে
কেন এমন দুঃখ এল হাসি খুশির দেশে।
আসলে কি এমনি করেই জীবনধারা বয়
মুখের ভীষণ কাছেই থাকে দুঃখ পাবার ভয়
ফুল ফোটানোর মাসেই আসে কালবৈশাখীর হানা।
বিপদ কোথায় লুকিয়ে থাকে যায় না তাকে জানা।
তাই বলে কি শিমুল পলাশ ফুটবে না আর কাল
রাত পোহালেই উঠবে ভরে কৃষ্ণচূড়ার ডাল।
হিংসুটে ঝড় আজকে যাদের হাত পা দিল ভেঙ্গে
না হয় আবার ঝড়ের হাতে দুঃখ পেতে হবে
ফুল ফুটিয়ে যাবেই তারা বসন্ত উৎসবে।

শিক্ষকই শ্রেষ্ঠ

আইশম বাকী বিল্লাহ
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
মোংলা সরকারি কলেজ

নিজের জ্ঞানকে বিলিয়ে দিয়ে
মানুষ গড়েন যিনি,
এই সমাজে শিক্ষক নামে
পরিচিতি হন তিনি।
হোক না রাজা, হোক না প্রজা,
হোক না কেউ জ্ঞানী,
শিক্ষকের কাছে কমবেশি কেউ
রয়েছি কিন্তু ঋণী।
দেশের গঠন, জাতির গঠন,
তাঁর সাধনার ফল
তাঁর চাইতে উর্ধ্বে নাই কেউ
থাকলে আমায় বল?
শিক্ষকতা মহান পেশা
এই ধরনী বলে,
লোভ লালসা তুচ্ছ হয়
তাঁদের পদতলে।
মানুষ গড়ার কারিগর তাঁরা
অবিরাম তাঁদের গতি
শিক্ষক হবো, শিক্ষা দেবো
হোক সকলের ব্রতি।

মোংলা নদীর তীরে

সুদেব মুখার্জী
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৩৫৬৬, মানবিক বিভাগ
মোংলা সরকারি কলেজ

এই মোংলা নদীর তীরে
কেন বারে বারে আসি ফিরে?
ফেরারী মন মানে না বাঁধা
গায় ব্যথাতুর সুরে।

ডাকছে আমায়, ডাকছে এখন মোংলা নদীর পাড়।
ডাকছে আমায় প্রিয়জনের মৃতদেহের হাড়।

ডাকছে আমায়, ডাকছে আজ, একলা ফাগুন দিনে।
ডাকছে আমায়, বিয়োগ ব্যথায়, যন্ত্রণারই ঋণে।

ডাকছে আমায় সকাল, দুপুর, কিংবা রাত্রি দিন।
ডাকছে আমার বুকে বাজিয়ে অশ্রু জলের বীণ।

ডাকছে আমায় নৌকা ডুবির স্মৃতি রোমন্থনে,
বলছে আমায় সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে দূর বনে।

ডাকছে আমায় সাজু বিরহে রুপাইর বাঁশের বাঁশি।
ডাকছে আমার প্রিয়জনের শেষ দেখা সেই হাসি।

ডাকছে আমায় রাক্ষুসে ঢেউ, ডাকছে আমায় পানি।
নদীর ঢেউয়ের শব্দ যেন, তার কান্না শুনি!

ও মন, তুই হারিয়েছিস যারে, আর কি পাবি তারে ?
উদাস মনে বসে কেন কাঁদিস নদীর তীরে।

একুশে ফেব্রুয়ারি

স্বর্ণা
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৩৬০০
মানবিক বিভাগ
মোংলা সরকারি কলেজ

একুশ তুমি মোদের গৌরব
বাঙালি জাতির সৌরভ
একুশ মানে প্রাণের ভাষা
একুশ মানে বাঙালির আশা।

কণ্ঠ রোধের ফন্দি করে
কেড়েছিলো ভাষা
গর্জে উঠে রাজ পথে বীর
করলো পূরণ আশা

ভাষার জন্য শহীদ যারা
তাদের করি স্মরণ
শহীদ মিনারে ফুলে ফুলে
করি স্মৃতিচরণ।

মায়ের ভাষা মুখের ভাষা
এনেছিলো বীর যারা
ভুবন মাঝে গেঁথে গেছে
স্বর্ণাক্ষরে তারা-

একুশ মোদের ভোর চেতনা
ভেঙেছে রণের সাজ
তোমাদের অবদান ভুলিবো না
যতদিন বাঁচিবে প্রাণ।

আমরা সেই যাত্রী

মারজানা আক্তার শিমলা
শ্রেণি : একদশ, রোল : ২৪৫৪২
মানবিক বিভাগ
মোংলা সরকারি কলেজ

নতুন সকালে আলো আসে,
মনের অন্ধকারটুকু সরে যায়;
শুরু হয় একটি নতুন যাত্রা,
প্রতিটি পা একটি নতুন গল্প বলে,

কলেজের মাঠে প্রতিটি চরণ
স্বপ্নের পথে চলতে থাকে,
তরুণ আশা, উদ্যমে ভরা,
স্মৃতি হয়ে উঠুক সোনালী সময়ের সঙ্গী।

চলতে চলতে আমরা বড় হবো,
জীবনটা গড়বো, স্বপ্নের মতো;
এটা শুধু শুরু শেষ নয়,
কলেজের বেঞ্চে লেখা হবে সত্যের পথ।

স্বপ্নের পাখি উড়বে আকাশে,
বিশ্ব জয়ের খেলা শুরু হবে;
আমরা সেই যাত্রী, যারা পৌঁছাবে,
বিশ্বে আমাদের নাম হবে গর্বের।

বন্ধু

আফসানা মিম
শ্রেণি-একাদশ, রোল-২৪২২৩
মোংলা সরকারি কলেজ

বন্ধু মানে আড্ডা হাসি
বন্ধু মানে মজা
বন্ধু মানে কলেজ শেষে
অনলাইনে খোঁজা।
বন্ধু মানে রাগের মাঝে
অভিমানটা স্পষ্ট,
বন্ধু মানে তোরা ছাড়া
আমার জীবন নষ্ট।

বন্ধু মানে পড়ার সময়
দুষ্টুমিটাও থাকে,
বন্ধু মানে হুমকি দেওয়া
"দেখে নিব তোকে।"
বন্ধু মানে দিনের শেষে
আমিও থাকি চুপ,
বন্ধু তোদের কাজের ফাকে
মিস করি যে খুব।

বাবা

শাওন ঢালী
শ্রেণি-একাদশ, রোল-২৪০২৬
মোংলা সরকারি কলেজ

খোকা তুই কেমন আছিস
আছিস কেমন বল?
আমার জন্য ভাবিস না রে
আছি আমি বেশ,
তোর মা তো আগেই গেছে
নেই কিছু তার শেষ।
কতদিন তোর সঙ্গে ফোনে
হয়নি কোনো কথা,
তাইতো তোকে ফোনে পেলে
শেষ হয় না ব্যথা।
আমায় কবে নিয়ে যাবি?
আমার বড্ড লাগে একা,
লাইনটা কি কেটেই গেল?
না কি কেটে দিলি খোকা!

আবু সাঈদ

সাথী আক্তার
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ২৪৬৩৩
মোংলা সরকারি কলেজ

বাংলার বুকে আজ রক্তের দাগ,
চেয়ে দেখ ওরে জালিমের দল
কে করিলো গুলি?
আজ মায়ের কোল হইলো খালি
আহারে খুনির দল
শোন সবাই ১৬ই জুলাই
আমি সেই ছেলের কথা-ই বলছি
কেমনে বলিবো সখি
চোখের জল ফেলছি।
তাহার গায়ে ছিলো কালো গেঞ্জি
হাতে ছিলো এক লাঠি
বুকে তাহার সাহস নিয়ে
রাজ পথে ছিলো দাঁড়িয়ে।
চোখ দুটো বুজে
বুকটা পেতে দেয়
দেহ খানা তার পড়েছে ঢুলে।
তবু রুখে দাড়াবার চেষ্টা করে
আমরা তো কারো রক্ত চাইনি,
চেয়েছিলাম অধিকার–
তারা মোদের বানিয়ে দিলো–
সন্ত্রাসী রাজাকার ॥

আমার সোনার দেশ

আমিনা আক্তার মুন্নি
শ্রেণি : একাদশ, বিভাগ : ব্যবসায় শিক্ষা
রোল : ২৪২০৩, মোংলা সরকারি কলেজ

একটি ছবির দেশ
পাল তোলা নাও হাওয়ার বেগে
ছুটছে দারুন বেশ
একটি সবুজ দেশ।
মাঠ ভরা তার সোনার ফসল
রূপের নাইতো শেষ
একটি সোনার তরী
চারদিকে দেখি শুধুই
সবুজের ছড়াছড়ি।
ভাটিয়ালি, জারি যার
ছড়ায় প্রাণের বেশ
একাটা স্বাধীন দেশ।
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে
পাওয়া সে দেশ
জানো কোন সেই দেশ?
সে যে সোনায় গড়া
আমার বাংলাদেশ!

ধ্বংস

সৌরভ তামিম
শ্রেণি : একদশ, রোলঃ ২৪০২১
বিভাগ : বিজ্ঞান
মোংলা সরকারি কলেজ

ধ্বংস লীলায় গড়া আমি,
জমে আছে এক মহা ধ্বংসস্তূপ।
নতুন করে গড়ার আশায়
খুঁজোনা এই ধ্বংস মানবকে,
পাবে শুধুই এক নিশ্চুপ।
তোমার মায়া এতটাই ছিল
এই মনের মৃত্যু ঘটলো।
এই ধ্বংসস্তূপে আজও
ধ্বংসলীলা চলমান,
আমি এক সর্বস্বান্ত প্রবাহমান।
চাইবার কত কি ছিলো,
তবে চেয়েছিলাম শুধু তোমায়।
হায় কি দুর্ভাগ্য আমার!
তোমায় ভালবেসে হারালাম আমায়।
কী মায়াবী তোমার ঐ মুখ,
মনে হয় এতেই আছে পৃথিবীর সর্বসুখ।
মানিনি পৃথিবীর নিয়মে গড়া বারণ,
না মানাটাই ছিল ধ্বংসের কারণ।
তোমার সৌন্দর্য দেখার পর
পৃথিবী সুন্দর হলো না,
মায়াবতী তুমি আমায় ভালোবাসলে না।
আজও তোমার মায়ার আগুনে জ্বলছে
আমার জীবনের দিন,
এ যে ধ্বংস, এক মহা ধ্বংস!

তুমিহীনা থাকে না কোনো মানবিক মহিমা

মেহেদী হাসান
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৩৬৫৮
শাখা : মানবিক, মোংলা সরকারি কলেজ

মুগ্ধতা ছিলো, ছিলো বিস্ময়,
তোমার বয়ে যাওয়া কূলে মুগ্ধ কিশোর
আকাশ নেমে এসে তোমাতে মেশে
দেখে সে দু'জনার রঙে একাকার
নক্ষত্রের আলোয় বিচিত্র ব্যাসনে
তোমাদের অন্তরতা দৃষ্টির অসীমে মেশে
চিক্‌চিক্ রূপোলি নাচন অঙ্গে যেন
নাক্ষত্রিক মুক্তোর বিছা
আঁকা-বাঁকা বাঁকে তুমি অপূর্বা উর্বশী
কতো শতো প্রাণের প্রিয় মুধকরী
দৃষ্টির দূরত্বে দেখি, তুমি এ গ্রহে শিরা-উপশিরা
হৃদপিণ্ড যেন সমুদ্র ব্যাপিয়া।
কি মায়া, কি কৌতূহলে অঙ্গে
ভাসিয়েছি ভেলা, ছুঁয়েছি শরীর
শীতল অনুভবে জেগেছিল রক্তে নাচন
প্রাকৃতিক বন্যতায় তোমাতে সেরেছি গোসল
স্নানাগারে কৃত্রিম ঝর্ণার মৃদু গুঞ্জন
বিধৌত শরীরে তোমার স্পর্শ রেখো
সর্পিল ভঙ্গিতে গড়িয়ে গড়িয়ে নামে
দূর কৃত্রিম নগরে, তুমি আজো আছো
স্মৃতির মায়াবি ঐশ্বর্য জুড়ে
যেন তুমি অক্ষয় অমর
যেন অকৃত্রিম ভালোবাসার কাঙ্ক্ষিত আখ্যান
তোমার প্রেমে মজে না
কোথায় আছে এমন দুর্মুখ!
বাণিজ্যিক কামে গড়া লোলুপ লাম্পট্যে যারা
তোমার শরীরে আঁকে ক্ষত
খঞ্জর হাতে দ্বৈরথে তোমার জন্য
রাখছি লাড়ইয়ের সুদৃঢ় প্রত্যয়
এ আমার করুনা নয়, নয় সাহানুভূতি কিংবা প্রীতি
তুমিহীনা আমার থাকে কী অস্তিত্ব?
থাকবে না কোনো মানবিক মহিমা।

কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক-কর্মচারীদের তালিকা

ক্রমিক নং	শিক্ষকবৃন্দের নাম	পদবী	যোগদানের তারিখ
১	জনাব সুশীল কুমার সরকার (বাংলা)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	০৯/০৭/১৯৮১
২	জনাব স্বপন কুমার বিশ্বাস(ইতিহাস)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	০৯/০৭/১৯৮১
৩	জনাব সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস(বাংলা)	প্রভাষক	০৯/০৭/১৯৮১
৪	জনাব সুশান্ত কুমার দাশ	প্রভাষক	০৯/০৭/১৯৮১
৫	জনাব এনামুল কবীর (অর্থনীতি)	প্রভাষক	০৯/০৭/১৯৮১
৬	জনাব জালাল উদ্দিন আহম্মদ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	প্রভাষক	০৯/০৭/১৯৮১
৭	জনাব মৃনাল কান্তি শিকদার (রসায়ন)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	০৯/০৯/১৯৮১
৮	জনাব সরকার নলিনী রঞ্জন (হিসাববিজ্ঞান)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	২৭/১২/১৯৮১
৯	জনাব ফাহমিদা আফরোজ (ইসলামের ইতিহাস)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	১৩/০৩/১৯৮২
১০	জনাব তৈয়াবুর রহমান গাজী (উদ্ভিদবিদ্যা)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	২৫/০৫/১৯৮৩
১১	জনাব বিভাষ চন্দ্র বিশ্বাস (বাংলা)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক (উপাধ্যক্ষ)	০৫/০১/১৯৮৩
১২	জনাব অজিত কুমার পাল (গণিত)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	১৩/১১/১৯৮৩
১৩	জনাব আনন্দ মোহন বিশ্বাস (অর্থনীতি)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	১৮/০৭/১৯৮৩
১৪	জনাব মনোজ কুমার মন্ডল (ইংরেজি)	প্রভাষক	০৯/০৭/১৯৮৪
১৫	জনাব কার্তিক চন্দ্র সরকার (পদার্থবিজ্ঞান)	প্রভাষক	০৫/০২/১৯৮৪
১৬	জনাব বিপ্লব কুমার মিস্ত্রী (ব্যবস্থাপনা)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	০২/০১/১৯৮৫
১৭	জনাব নন্দ কিশোর অধিকারী (পদার্থবিজ্ঞান)	প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক	০২/০২/১৯৮৫
১৮	জনাব বনমালা মৃধা (ইংরেজি)	প্রভাষক	০২/০৮/১৯৮৬
১৯	জনাব জগদীশ মন্ডল (ইংরেজি)	প্রভাষক	১৩/০৯/১৯৮৮
২০	জনাব পরভীন জাহান (বাংলা)	প্রভাষক	২৫/০৯/১৯৮৮
২১	জনাব আমজাদ হোসেন মোল্ল্যা (ইংরেজি)	প্রভাষক	০৪/০৫/১৯৮৯
২২	জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	প্রভাষক, অধ্যক্ষ	১১/০৯/১৯৮৯
২৩	জনাব হাওলাদার আবু জাফর (ইসলামের ইতিহাস)	প্রভাষক	১৭/১১/১৯৯১
২৪	জনাব কুবের চন্দ্র মন্ডল (ইতিহাস)	প্রভাষক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	১৭/১১/১৯৯১
২৫	জনাব মল্লিক অহিদুজ্জামান (অর্থনীতি)	প্রভাষক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	১৭/১১/১৯৯১
২৬	জনাব শেখ আনোয়ার হোসেন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	প্রভাষক (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	১৭/১১/১৯৯১
২৭	জনাব গৌতম কুমার বিশ্বাস (হিসাববিজ্ঞান)	প্রভাষক	১৮/১১/১৯৯১
২৮	জনাব কৃষ্ণ পদ রায় (ইংরেজি)	প্রভাষক	১৫/১১/১৯৯২
২৯	জনাব মাধব চন্দ্র রুদ্র (দর্শন)	প্রভাষক	১৫/১১/১৯৯২
৩০	জনাব শেখ শামসুর রহমান (দর্শন)	প্রভাষক	০১/০৭-১৯৯৪
৩১	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াজেদ (ইসলাম শিক্ষা)	প্রভাষক	২১/১০/১৯৯৫
৩২	জনাব শুভময় ঘোষ (ইংরেজি)	প্রভাষক	০৫/০২/২০০১
৩৩	জনাব খন্দকার মাক্কামাম মাহমুদা (সমাজকল্যাণ)	প্রভাষক	০৫/০২/২০০১

৩৪	জনাব আনোয়ার হোসেন মৃধা (ইংরেজি)	প্রভাষক	২২/০৯/২০০২
৩৫	জনাব সুখদেব বিশ্বাস (ইংরেজি)	প্রভাষক	০৮/০২/২০০৩
৩৬	জনাব শ্যামল কুমার বিশ্বাস (ইংরেজি)	প্রভাষক	০৮/০২/২০০৩
৩৭	জনাব নাদিম মোহাম্মদ ফয়সাল (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	প্রভাষক (৪১তম বিসিএস)	০৪/১২/২০২২
৩৮	জনাব বিকাশ চন্দ্র হালদার (জীববিজ্ঞান)	প্রদর্শক	৩০/০৬/১৯৯২
৩৯	জনাব কনিকা মণ্ডল (জীববিজ্ঞান)	প্রদর্শক	২৯/০৯/২০০২
৪০	জনাব রণজ কুমার মণ্ডল (জীববিজ্ঞান)	প্রদর্শক	০১/০৩/২০০৮
৩৮	জনাব সেখ আবদুল জব্বার	শরীরচর্চা শিক্ষক	২৫/৬/১৯৯২

ক্রমিক নং	কর্মচারীবৃন্দের নাম	পদবী	যোগদানের তারিখ
১	জনাব মনিমোহন অধিকারী	সহঃ গ্রন্থাগারিক	২৭/০৬/১৯৯২
২	জনাব রনজিৎ কুমার রায়	সহঃ গ্রন্থাগারিক	০১/০৫/১৯৮২
৩	জনাব খান আবুবক্কর সিদ্দিক	সহঃ গ্রন্থাগারিক	২১/০১/১৯৮৮
৪	জনাব ধ্রুব দাস মজুমদার	অফিস সহকারী	২১/১২/১৯৮৪
৫	জনাব সচিন্দ্রনাথ বিশ্বাস	অফিস সহকারী	০২/০১/১৯৮৫
৬	জনাব সমর হালদার	অফিস সহকারী	০১/০২/১৯৮৯
৭	বিমল কৃষ্ণ ভাণ্ডারী	হিসাব রক্ষক	২১/০১/১৯৮৪
৮	জনাব ফনিভূষণ মিস্ত্রী	এম.এল.এস.এস	০১/১২/১৯৮৩
৯	জনাব কালিতারা মিস্ত্রী	আয়া	১৮/১১/১৯৮৭
১০	জনাব পরিতোষ হালদার	এম.এল.এস.এস	১৫/১০/১৯৯৫
১১	জনাব বিনয় মন্ডল	দিবা প্রহরী	৩০/০৬/১৯৮২
১২	জনাব আব্দুর রহমান	নৈশ প্রহরী	২৫/৬/১৯৯২
১৩	জনবা রাবেয়া বেগম	আয়া	২৭/০৬/১৯৯২
১৪	জনাব সুরেন্দ্র নাথ কীর্ত্তুনিয়া	নৈশ প্রহরী	৩১/০৬/১৯৮২
১৫	জনাব আব্দুস সোবহান হাওলাদার	নৈশ প্রহরী	১৩/০৯/১৯৮৮
১৬	জনাব মনমোহন বিশ্বাস	দিবা প্রহরী	১৩/০৯/১৯৮৮
১৭	জনাব মুহসিন আকন্দ	বিজ্ঞানাগার সহকারী	২১/১২/১৯৮৪

কলেজের শিক্ষক কর্মকর্তাবৃন্দ

অধ্যাপক কে এম রব্বানী
অধ্যক্ষ

শ্যামা প্রসাদ সেন
প্রভাষক
সমাজকর্ম

ড. অসিত কুমার বসু
প্রভাষক
সংস্কৃত

ড. অপর্ণা অধিকারী
প্রভাষক
সংস্কৃত

প্রদীপ অধিকারী
প্রভাষক
দর্শন

আবু ইব্রাহীম শাহ মোঃ বাকী বিল্লাহ
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিশ্বজিৎ মণ্ডল
প্রভাষক
গণিত

মনোজ কান্তি বিশ্বাস
প্রভাষক
বাংলা

এস.এম. মাহবুবুর রহমান
প্রভাষক
ইংরেজি

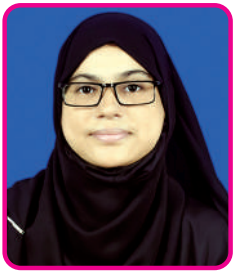

মমতাজ খানম
প্রভাষক
ইংরেজি

প্রমীলা রায়
প্রভাষক
ইতিহাস

সাহারা বেগম
প্রভাষক
ব্যবস্থাপনা

পাপিয়া হালদার
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোসাঃ নিলুফা খাতুন
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস

রঞ্জিতা মণ্ডল
প্রভাষক
সমাজকর্ম

বীনা বিশ্বাস
প্রভাষক
ভূগোল

রূপা দাস
প্রভাষক
বাংলা

নিগার সুলতানা সুমী
প্রভাষক
মার্কেটিং

দেবদাস বাড়ই
প্রভাষক
হিসাববিজ্ঞান

মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

পলাশ চক্রবর্তী
প্রভাষক
হিসাববিজ্ঞান

নন্দ কিশোর পাল
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোঃ কামাল উদ্দিন
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

খাদিজা খাতুন
প্রভাষক
ইসলাম শিক্ষা

মোঃ ইব্রাহিম খলিল
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস

নাজমুল হক
প্রভাষক
হিসাববিজ্ঞান

আরিফুজ্জামান
প্রভাষক
অর্থনীতি

মোঃ মাহবুবুর রহমান
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মেহেদী হাসান
প্রভাষক
অর্থনীতি

আশিকুর রহমান
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রভাষক
ইতিহাস

মোঃ সাইদুজ্জামান মিন্টু
বিজ্ঞান প্রদর্শক
রসায়ন

শেফালী মণ্ডল
বিজ্ঞান প্রদর্শক
জীববিজ্ঞান

কলেজের কর্মচারীবৃন্দ

সুকুমার বিশ্বাস
অফিস সহকারী কাম
কম্পিউটার অপারেটর

অনিল কৃষ্ণ বিশ্বাস
হিসাব রক্ষক

মোঃ আজিজুল খান
অফিস সহকারী কাম
কম্পিউটার অপারেটর

গণেশ কুমার সাহা
অফিস সহকারী কাম
কম্পিউটার অপারেটর

বাসুদেব বিশ্বাস
অফিস সহায়ক

অজিৎ মণ্ডল
অফিস সহায়ক

রমেশ মণ্ডল
অফিস সহায়ক

মোঃ সাইফুল ইসলাম মোল্লা
অফিস সহায়ক

বিথিকা মিস্ত্রী
আয়া

কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আলোকচিত্র

ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি "আমার ক্যাম্পাস, আমিই রাখব পরিচ্ছন্ন"

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী ১৪৪৬ (২০২৪) উদ্‌যাপন

সরস্বতী পূজা ২০২৪ উদ্‌যাপন

জনাব শেখ আনোয়ার হোসেন, প্রভাষক ও বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-এর অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা

কলেজ ম্যাগাজিন 'ম্যানগ্রোভ'-এর ১ম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রথম দিনের দিকনির্দেশনামূলক ক্লাস

শিক্ষককর্মকর্তাদের ইনহাউজ ট্রেইনিং

"এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই" প্রতিপাদ্য নিয়ে তারুন্যের উৎসব ২০২৫

তারুন্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের খেলোয়াড়বৃন্দের সাথে শিক্ষকমণ্ডলী

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৪ এর কিছু অর্জন

জুলাই গণআন্দোলনের শহীদদের এবং আহতদের জন্য দোয়া ও অলোচনা অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবসের আলোচনা সভা

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

৪৩ বিসিএস-এর মাধ্যমে যোগদানকৃত ৪ জন কর্মকর্তার সংবর্ধনা

মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন

বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কর্মসূচি ২০২৪

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

বর্ষবরণ ১৪৩২-এর অনুষ্ঠান

বর্ষবরণ ১৪৩২-এর শোভাযাত্রার প্রস্তুতি

পরিবেশ রক্ষায় পলিথিন, প্লাস্টিক বর্জন ও পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক সেমিনার। আলোচক বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী জনাব শরীফ জামিল ও জনাব মোঃ নূর আলম শেখ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর উদ্বোধন

সুন্দরবন রক্ষায় পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক পটগান আয়োজন। সহযোগিতায়- রূপান্তর

শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময়

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫-এর অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ

ম্যানগ্রোভ ১ম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন